প্রবন্ধ

রাজা প্রজা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচিপত্র

- ইংরাজ ও ভারতবাসী 2
- রাজনীতির দ্বিধা 38
- অপমানের প্রতিকার 47
- সুবিচারের অধিকার 58
- কণ্ঠরোধ 67
- ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌ 78
- রাজভক্তি 84
- বহুরাজকতা 95
- পথ ও পাথেয় 99
- সমস্যা 132

ইংরাজ ও ভারতবাসী

There is nothing like love and admiration for bringing people to a likeness with what they love and admire; but the Englishman seems never to dream of employing these influences upon a race he wants to fuse with himself। He employs simply material interests for his work of fusion; and, beyond these nothing except scorn and rebuke। Accordingly there is no vital union between him and the races he has annexed; and while France can freely boast of her magnificent unity, a unity of spirit no less than of name between all the people who compose her, in our country the Englishman proper is in union of spirit with no one except other Englishmen proper like himself।

–Matthew Arnold

আমাদের প্রাচীন পুরাণে ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, চরিত্রে বা আচরণে একটা ছিদ্র না পাইলে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যেক জাতিরই প্রায় একটা-কোনো ছিদ্র থাকে। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যেখানে মানুষের দুর্বলতা সেইখানে তাহার স্নেহও বেশি। ইংরাজও আপনার চরিত্রের মধ্যে ঔদ্ধত্যকে যেন কিছু বিশেষ গৌরবের সহিত পালন করে। তাহার দ্বৈপায়ন সংকীর্ণতার মধ্যে সে যে অটল, এবং ভ্রমণ অথবা রাজত্ব উপলক্ষে সে যাহাদের সংস্রবে আসে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার যে কিছুমাত্র প্রয়াস পায় না, সাধারণ “জন”-পুংগব এই গুণটিকে মনে মনে কিছু যেন শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে। তাহার ভাবখানা এই যে, ঢেঁকি যেমন স্বর্গেও ঢেঁকি তেমনি ইংরাজ সর্বত্রই খাড়া ইংরাজ, কিছুতেই তাহার আর অন্যথা হইবার জো নাই।

এই-যে মনোহারিত্বের অভাব, এই-যে অনুচর-আশ্রিত-বর্গের অন্তরঙ্গ হইয়া তাহাদের মন বুঝিবার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এই-যে সমস্ত পৃথিবীকে নিজের সংস্কার অনুসারেই বিচার করা, ইংরাজের চরিত্রের এই ছিদ্রটি অলক্ষ্মীর একটা প্রবেশপথ।

কোথায় কোন্ শত্রু আসিবার সম্ভাবনা আছে ইংরাজ সে ছিদ্র যত্নপূর্বক রোধ করে, যেখানে যত পথঘাট আছে সর্বত্রই পাহারা বসাইয়া রাখে এবং আশঙ্কার অঙ্কুরটি পর্যন্ত পদতলে দলন করিয়া ফেলে, কেবল নিজের স্বভাবের মধ্যে যে-একটি নৈতিক বিঘ্ন আছে সেইটাকে প্রতিদিন প্রশ্রয় দিয়া দুর্দম করিয়া তুলিতেছে- কখনো কখনো অল্পস্বল্প আক্ষেপ করিয়াও থাকে- কিন্তু মমতাবশত কিছুতেই তাহার গায়ে হাত তুলিতে পারে না।

ঠিক যেন একজন লোক বুট পায়ে দিয়া আপনার শস্যক্ষেত্রময় হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেছে, পাছে পাখিতে শস্যের একটি কণামাত্র খাইয়া যায়! পাখি পলাইতেছে বটে, কিন্তু কঠিন বুটের তলায় অনেকটা ছারখার হইয়া যাইতেছে তাহার কোনো খেয়াল নাই।

আমাদের কোনো শত্রুর উপদ্রব নাই, বিপদের আশঙ্কা নাই, কেবল বুকের উপরে অকস্মাৎ সেই বুটটা আসিয়া পড়ে। তাহাতে আমরা বেদনা পাই এবং সেই বুটওয়ালার যে কোনো লোকসান হয় না তাহা নহে। কিন্তু ইংরাজ সর্বত্রই ইংরাজ, কোথাও সে আপনার বুটজোড়াটা খুলিয়া আসিতে রাজি নহে।

আয়র্লণ্ডের সহিত ইংরাজের যে-সমস্ত খিটিমিটি বাধিয়াছে সে-সকল কথা আমাদের পাড়িবার আবশ্যক নাই; অধীন ভারতবর্ষেও দেখা যাইতেছে, ইংরাজের সহিত ইংরাজি-শিক্ষিতদের ক্রমশই একটি অ-বনিবনাও হইয়া আসিতেছে। তিলমাত্র অবসর পাইলে কেহ কাহাকেও ছাড়িতে চায় না। ইঁটটির পরিবর্তে পাটকেলটি চলিতেছেই।

সূচিপত্র

আমরা যে-সকল জায়গায় সুবিচারপূর্বক পাটকেল নিক্ষেপ করি তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলে অন্ধকারেই ঢেলা মারি। আমাদের কাগজে পত্রে অনেক সময় আমরা অন্যায় খিটিমিটি করিয়া থাকি এবং অমূলক কোন্দল উত্থাপন করি, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তাহার কোনোটা সত্য কোনোটা মিথ্যা, কোনোটা ন্যায় কোনোটা অন্যায় হইতে পারে; আসল বিচার্য বিষয় এই যে, আজকাল এইরূপ পাটকেল ছুঁড়িবার প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে কেন। শাসনকর্তা খবরের কাগজের কোনো-একটা প্রবন্ধবিশেষকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া সম্পাদককে এবং হতভাগ্য মুদ্রাকরকে পর্যন্ত জেলে দিতে পারে, কিন্তু প্রতিদিনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পথে এই, যে সমস্ত ছোটো ছোটো কাঁটাগাছগুলি গজাইয়া উঠিতেছে তাহার বিশেষ কী প্রতিকার করা হইল।

এই কাঁটাগাছগুলির মূল যখন মনের মধ্যে তখন ইহাকে উৎপাটন করিতে হইলে সেই মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু পাকা রাস্তা ও কাঁচা রাস্তা-যোগে ইংরাজরাজের আর সর্বত্রই গতিবিধি আছে, কেবল দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মনের মধ্যেই নাই। হয়তো সে জায়গাটাতে প্রবেশ করিতে হইলে ঈষৎ একটুখানি মাথা হেলাইয়া ঢুকিতে হয়, কিন্তু ইংরাজের মেরুদণ্ড কোনোখানেই বাঁকিতে চায় না।

অগত্যা ইংরাজ আপনাকে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, এই-যে খবরের কাগজে কটুকথা বলিতেছে, সভা হইতেছে, রাজ্যতন্ত্রের অপ্রিয় সমালোচনা চলিতেছে, ইহার সহিত “পীপ্‌ল্‌”এর কোনো যোগ নাই; এ কেবল কতকগুলি শিক্ষিত পুতুলনাচওয়ালার বুজরুগিমাত্র। বলে যে, ভিতরে সমস্তই আছে ভালো; বাহিরে যে একটু-আধটু বিকৃতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে

সে চতুর লোকে রঙ করিয়া দিয়াছে। তবে তো আর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবার আবশ্যক নাই। কেবল যে চতুর লোকটাকে সন্দেহ করা যায় তাহাকে শাসন করিয়া দিলেই চুকিয়া যায়।

ওইটেই ইংরাজের দোষ- সে কিছুতেই ঘরে আসিতে চায় না। কিন্তু দূর হইতে, বাহির হইতে, কোনোক্রমে স্পর্শসংস্রব বাঁচাইয়া মানুষের সহিত কারবার করা যায় না- যে পরিমাণে দূরে থাকা যায় সেই পরিমাণেই নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইতে হয়। মানুষ তো জড়যন্ত্র নহে যে তাহাকে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়া যাইবে; এমন-কি, পতিত ভারতবর্ষেরও একটা হৃদয় আছে এবং সে হৃদয়টা সে তাহার জামার আস্তিনে ঝুলাইয়া রাখে নাই।

জড়পদার্থকেও বিজ্ঞানের সাহায্যে নিগূঢ়রূপে চিনিয়া লইতে হয়, তবেই জড়প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারা যায়। মনুষ্যলোকে যাহারা স্থায়ী প্রভাব রক্ষা করিতে চাহে তাহাদের অন্যান্য অনেক গুণের মধ্যে অন্তরঙ্গরূপে মানুষ-চিনিবার বিশেষ গুণটি থাকা আবশ্যক। মানুষের অত্যন্ত কাছে যাইবার যে ক্ষমতা সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা।

ইংরাজের বিস্তর ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেইটি নাই। সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে, কিন্তু কিছুতেই কাছে আসিতে চাহে না। কোনোমতে উপকারটা সারিয়া ফেলিয়া অমনি তাড়াতাড়ি সরিতে পারিলে বাঁচে। তাহার পরে সে ক্লবে গিয়া পেগ্ খাইয়া বিলিয়ার্ড খেলিয়া অনুগৃহীতদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগ-পূর্বক তাহাদের বিজাতীয় অস্তিত্ব শরীরমনের নিকট হইতে যথাসাধ্য দূরীকৃত করিয়া রাখে।

ইহারা দয়া করে না, উপকার করে; স্নেহ করে না, রক্ষা করে; শ্রদ্ধা করে না, অথচ ন্যায়াচরণের চেষ্টা করে; ভূমিতে জল সেচন করে না, অথচ রাশি রাশি বীজ বপন করিতে কার্পণ্য নাই।

সূচিপত্র

কিন্তু তাহার পর যখন যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার শস্য উৎপন্ন হয় না তখন কি কেবলই মাটির দোষ দিবে। এ নিয়ম কি বিশ্বব্যাপী নহে যে, হৃদয়ের সহিত কাজ না করিলে হৃদয়ে তাহার ফল ফলে না।

আমাদের দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনেকেই ইংরাজ-কৃত উপকার যে উপকার নহে ইহাই প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। হৃদয়শূন্য উপকার গ্রহণ করিয়া তাহারা মনের মধ্যে কিছুতেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছে না। কোনোক্রমে তাহারা কৃতজ্ঞতার দায় হইতে আপনাকে যেন মুক্ত করিতে চাহে। সেইজন্য আজকাল আমাদের কাগজে পত্রে কথায় বার্তায় ইংরাজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুতর্ক দেখা যায়।

এক কথায়, ইংরাজ নিজেকে আমাদের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু প্রিয় করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করে নাই; পথ্য দেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বাদ সঞ্চার করিয়া দেয় না; অবশেষে যখন বমনোদ্রেক হয় তখন চোখ রাঙাইয়া হুহুংকার দিয়া উঠে।

আজকালকার অধিকাংশ আন্দোলন গূঢ় মনঃক্ষোভ হইতে উৎপন্ন। এখন প্রত্যেক কথাটাই দুই পক্ষের হারজিতের কথা হইয়া দাঁড়ায়। হয়তো যেখানে পাঁচটা নরম কথা বলিলে উপকার হয় সেখানে আমরা তীব্র ভাষায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে থাকি, এবং যেখানে একটা অনুরোধ পালন করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই যেখানেও অপর পক্ষ বিমুখ হইয়া থাকে।

কিন্তু বৃহৎ অনুষ্ঠান মাত্রেই আপস ব্যতীত কাজ চলে না। পঞ্চবিংশতি কোটি প্রজাকে সুশৃঙ্খলায় শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে। এতবড়ো বৃহৎ রাজশক্তির সহিত যখন কারবার করিতে হয় তখন সংযম অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনার আবশ্যক। এইটে জানা চাই, গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলেই একটা-কিছু

করিতে পারে না; সে আপনার বৃহত্ত্বে অভিভূত, জটিলতায় আবদ্ধ। তাহাকে একটুখানি নড়িতে হইলেই অনেক দূর হইতে অনেকগুলা কল চালনা করিতে হয়।

আমাদের এখানে আবার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ভারতবর্ষীয় এই দুই অত্যন্ত বিসদৃশ সম্প্রদায় লইয়া কারবার। উভয়ের স্বার্থ অনেক স্থলেই বিরোধী। রাজ্যতন্ত্রের যে চালক সে এই দুই বিপরীত শক্তির কোনোটাকেই উপেক্ষা করিতে পারে না; যে করিতে চায় সে নিষ্ফল হয়। আমরা যখন আমাদের মনের মতো কোনো- একটা প্রস্তাব করি তখন মনে করি, গবর্মেণ্টের পক্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের বাধাটা যেন বাধাই নহে। অথচ প্রকৃতপক্ষে শক্তি তাহারই বেশি। প্রবল শক্তিকে অবহেলা করিলে কিরূপ সংকটে পড়িতে হয় ইল্‌বার্ট- বিলের বিপ্লবে তাহার পরিচয় পাওয়া গেছে। সৎপথে এবং ন্যায়পথেও রেলগাড়ি চালাইতে হইলে আগে যথোচিত উপায়ে মাটি সমতল করিয়া লাইন পাতিতে হইবে। ধৈর্য ধরিয়া সেই সময়টুকু যদি অপেক্ষা করা যায় এবং সেই কাজটা যদি সম্পন্ন হইতে দেওয়া যায়, তার পরে দ্রুতবেগে চলিবার খুব সুবিধা হয়।

ইংলণ্ডে রাজাপ্রজার মধ্যে বৈষম্য নাই, এবং সেখানে রাজ্যতন্ত্রের কল বহুকাল হইতে চলিয়া সহজ হইয়া আসিয়াছে। তবু সেখানে একটা হিতজনক পরিবর্তন সাধন করিতেও কত কৌশল কত অধ্যবসায় প্রয়োগ এবং কত সম্প্রদায়কে কত ভাবে চালনা করিতে হয়। অথচ সেখানে বিপরীত স্বার্থের এমন তুমুল সংঘর্ষ নাই; সেখানে একবার যুক্তি দ্বারা প্রস্তাববিশেষের উপকারিতা সকলের কাছে প্রমাণ করিবামাত্র সাধারণ অথবা অধিকাংশের স্বার্থ এক হইয়া তাহা গ্রহণ করে। আর আমাদের দেশে যখন দুই শক্তি লইয়া কথা এবং আমরাই যখন সর্বাংশে দুর্বল তখন কেবল ভাষার বেগে গবর্মেণ্ট্‌কে

বিচলিত করিবার আশা করা যায় না। নানা দূরগামী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

রাজকীয় ব্যাপারে সর্বত্রই ডিপ্লম্যাসি আছে এবং ভারতবর্ষে আমাদের পক্ষে তাহার সর্বাপেক্ষা আবশ্যক। আমি ইচ্ছা করিতেছি এবং আমার ইচ্ছা অন্যায় নহে বলিয়াই পৃথিবীতে কাজ সহজ হয় না। যখন চুরি করিতে যাইতেছি না, শ্বশুরবাড়ি যাইতেছি, তখন পথের মধ্যে যদি একটা পুষ্করিণী পড়ে তবে তাহার উপর দিয়াই হাঁটিয়া চলিয়া যাইব এমন পণ করিয়া বসিলে, চাই কি, শ্বশুরবাড়ি না পৌঁছিতেও পারি। সে স্থলে পুকুরটা ঘুরিয়া যাওয়াই ভালো। আমাদের রাজনৈতিক শ্বশুরবাড়ি, যেখানে ক্ষীরটা, সরটা, মাছের মুড়াটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, সেখানে যাইতে হইলেও নানা বাধা নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যেখানে লঙ্ঘন করিলে চলে সেখানে লঙ্ঘন করিতে হইবে, যেখানে সে সুবিধা নাই সেখানে রাগারাগি করিতে না বসিয়া ঘুরিয়া যাওয়া ভালো।

ডিপ্লম্যাসি-অর্থে যে কপটাচরণ বুঝিতে হইবে এমন কথা নাই। তাহার প্রকৃত মর্ম এই, নিজের ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তি-দ্বারা অকস্মাৎ বিচলিত না হইয়া কাজের নিয়ম ও সময়ের সুযোগ বুঝিয়া কাজ করা।

কিন্তু আমরা সে দিক দিয়া যাই না। আমরা কাজ পাই বা না পাই, কথা একটাও বাদ দিতে পারি না। তাহাতে কেবল যে আমাদের অনভিজ্ঞতা ও অবিবেচনা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, কাজ আদায়ের ইচ্ছার অপেক্ষা দুয়ো দিবার, বাহবা লইবার এবং মনের ঝাল ঝাড়িবার ইচ্ছা আমাদের বেশি। তাহার একটা সুযোগ পাইলে আমরা এত খুশি হই যে, তাহাতে আসল কাজের কত ক্ষতি হইল তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। এবং কটু

ভর্ৎসনার পর সংগত প্রার্থনা পূরণ করিতেও গবর্মেন্টের মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, পাছে প্রজার স্পর্ধা বাড়িয়া উঠে।

ইহার প্রধান কারণ, মনের ভিতরে এমন-একটা অসদ্‌ভাব জন্মিয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে যে, উভয় পক্ষেরই কর্তব্যপালন ক্রমশই কিছু কিছু করিয়া দুরূহ হইতেছে। রাজাপ্রজার এই অহরহ কলহ দেখিতেও কিছুমাত্র ভালো হইতেছে না। গবর্মেণ্টও বাহ্যত যেমনই হউক, মনে মনে যে এ সম্বন্ধে উদাসীন তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু উপায় কী। ব্রিটিশ চরিত্র, হাজার হউক, মনুষ্যচরিত্র তো বটে।

ভাবিয়া দেখিলে এ সমস্যার মীমাংসা সহজ নহে।

সব-প্রথম সংকট বর্ণ লইয়া। শরীরের বর্ণটা যেমন ধুইয়া-মুছিয়া কিছুতেই দূর করা যায় না তেমনি বর্ণসম্বন্ধীয় যে সংস্কার সেটা মন হইতে তাড়ানো বড়ো কঠিন। শ্বেতকায় আর্যগণ কালো রঙটাকে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। এই অবসরে বেদের ইংরাজি তর্জমা এবং এন্‌সাইক্লোপীডিয়া হইতে এ সম্বন্ধে অধ্যায়,সূত্র এবং পৃষ্ঠাঙ্ক-সমেত উৎকট প্রমাণ আহরণ করিয়া পাঠকদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে চাহি না। কথাটা সকলেই বুঝিবেন। শ্বেত-কৃষ্ণে যেন দিনরাত্রির ভেদ। শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত, কর্মশীল, অনুসন্ধানতৎপর; আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিশ্চেষ্ট, কর্মহীন, স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট। এই শ্যামা-প্রকৃতিতে হয়তো রাত্রির মতো একটা গভীরতা, মাধুর্য, স্নিগ্ধ করুণা এবং সুনিবিড় আত্মীয়তার ভাব আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যস্ত চঞ্চল শ্বেতাঙ্গের তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর নাই এবং তাহার কাছে ইহার যথেষ্ট মূল্যও নাই। তাহাদিগকে এ কথা বলিয়াও কোনো ফল নাই যে, কালো গরুতেও সাদা দুধ দিয়া থাকে এবং ভিন্ন বর্ণের মধ্যে হৃদয়ের একটা গভীর ঐক্য আছে। কিন্তু কাজ নাই এ-সকল

ওরিয়েণ্টাল উপমা-তুলনায়। কথাটা এই যে, কালো রঙ দেখিবামাত্র শ্বেতজাতির মন কিছু বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না।

তার পরে বসনভূষণ-অভ্যাস-আচারে প্রত্যেক বিষয়েই এমন-সকল বৈসাদৃশ্য আছে যাহা হৃদয়কে কেবলই প্রতিহত করিতে থাকে।

শরীর অর্ধাবৃত রাখিয়াও যে মনের অনেক সদ্‌গুণ পোষণ করা যাইতে পারে, মনের গুণগুলা যে ছায়াপ্রিয় শৌখিনজাতীয় উদ্ভিজ্জের মতো নহে, তাহাকে যে জিন-বনাতের দ্বারা না মুড়িলেও অন্য উপায়ে রক্ষা করা যায়, সে-সমস্ত তর্ক করা মিথ্যা। ইহা তর্কের কথা নহে, সংস্কারের কথা।

এক, নিকট-সংস্রবে এই সংস্কারের বল কতকটা অভিভূত হইতে পারে। কিন্তু ওই সংস্কারই আবার নিকটে আসিতে দেয় না। যখন স্টিমার ছিল না এবং আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া পালের জাহাজ সুদীর্ঘ কালে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া পৌঁছিত তখন ইংরাজ দেশী লোকের সঙ্গে কিছু যেন বেশি ঘনিষ্ঠতা করিত। কিন্তু আজকাল সাহেব তিনটি মাসের ছুটি পাইলেই তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে পলাইয়া গিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত ধুলা ধৌত করিয়া আসেন, এবং ভারতবর্ষেও তাঁহাদের আত্মীয়সমাজ ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে, এইজন্য যে দেশ তাঁহারা জয় করিয়াছেন সে দেশে থাকিয়াও যথাসম্ভব না থাকা এবং যে জাতিকে শাসন করিতেছেন সে জাতিকে ভালো না বাসিয়াও কাজ করা সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সহস্র ক্রোশ দূর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া একটি সম্পূর্ণ বিদেশী রাজ্য নিতান্ত আপিসের কাজের ন্যায় দিনের বেলায় শাসন করিয়া, সন্ধ্যাবেলায় পুনশ্চ সমুদ্রে খেয়া দিয়া বাড়ি গিয়া তপ্ত ভাত খাওয়া, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে।

এক তো, আমরা সহজেই বিদেশী- এবং আমাদের রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ ইংরাজের স্বভাবতই অরুচিকর, তাহার উপরে আরও একটা উপসর্গ

আছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-সমাজ এ দেশে যতই প্রাচীন হইতেছে ততই তাহার কতকগুলি লোকব্যবহার ও জনশ্রুতি ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। যদিও-বা কোনো ইংরাজ স্বাভাবিক উদারতা ও সহৃদয়তা -গুণে বাহ্য বাধাসকল দূর করিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবার পথ পাইতেন এবং আমাদিগকে অন্তরে আহ্বান করিবার জন্য দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেন, তিনি এখানে আসিবামাত্র ইংরাজসমাজের জালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার নিজের স্বাভাবিক সংস্কার এবং স্বজাতিসমাজের পুঞ্জীভূত সংস্কার একত্র হইয়া একটা অলঙ্ঘ্য বাধার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন বিদেশী নূতন বিদেশীকে আমাদের কাছে আসিতে না দিয়া তাঁহাদের দুর্গম সমাজদুর্গের মধ্যে কঠিন পাষাণময় স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখেন।

স্ত্রীলোক সমাজের শক্তিস্বরূপ। রমণী চেষ্টা করিলে বিরোধী পক্ষের মিলন সাধন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় সংস্কারের বশ। আমরা সেই অ্যাংলো-ইণ্ডীয় রমণীগণের স্নায়ুবিকার ও শিরঃপীড়া-জনক। সেজন্য তাঁহাদের কী দোষ দিব, সে আমাদের অদৃষ্টদোষ। বিধাতা আমাদিগকে সর্বাংশেই তাঁহাদের রুচিকর করিয়া গড়েন নাই।

তাহার পরে, আমাদের মধ্যে ইংরাজেরা যেভাবে আমাদের সম্বন্ধে বলা-কহা করে, চিন্তামাত্র না করিয়া আমাদের প্রতি যে-সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করে, এবং আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে না জানিয়াও আমাদের যে- সমস্ত কুৎসাবাদ করিয়া থাকে, প্রত্যেক সামান্য কথাটিতে আমাদের প্রতি তাহাদের যে বদ্ধমূল অপ্রেম প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা নবাগত ইংরাজ অল্পে অল্পে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিধিবিড়ম্বনায় আমরা ইংরাজের অপেক্ষা অনেক দুর্বল, এবং ইংরাজকৃত অসম্মানের কোনো প্রতিকার করিতে পারি না। যে নিজের সম্মান উদ্ধার করিতে পারে না, এ পৃথিবীতে সে সম্মান পায় না। যখন একজন তাজা বিলাতি ইংরাজ আসিয়া দেখে যে আমরা অপমান নিশ্চেষ্টভাবে বহন করি তখন আমাদের 'পরে আর তাহার শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।

তখন তাহাদিগকে কে বুঝাইবে যে, অপমান সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নহি, কিন্তু আমরা দরিদ্র এবং আমরা কেহই স্বপ্রধান নহি, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক-একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতিনিধি। তাহার উপরে কেবল তাহার একলার নহে, তাহার পিতামাতা ভ্রাতা-স্ত্রীপুত্র-পরিবারের জীবনধারণ নির্ভর করিতেছে। তাহাকে অনেক আত্মসংযম আত্মত্যাগ করিয়া চলিতে হয়। ইহা তাহার চিরদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস। সে যে ক্ষুদ্র আত্মরক্ষণেচ্ছার নিকট আত্মসম্মান বলি দেয় তাহা নহে, বৃহৎ পরিবারের নিকট, কর্তব্যজ্ঞানের নিকট দিয়া থাকে। কে না জানে দরিদ্র বাঙালি কর্মচারীগণ কতদিন সুগভীর নির্বেদ এবং সুতীব্র ধিক্কারের সহিত আপিস হইতে চলিয়া আসে, তাহাদের অপমানিত জীবন কী অসহ্য দুর্ভর বলিয়া বোধ হয়, সে তীব্রতা এত আত্যন্তিক যে, সে অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে- কিন্তু তথাপি তাহার পরদিন যথাসময়ে ধুতির উপর চাপকানটি পরিয়া সেই আপিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেই মসীলিপ্ত ডেস্কে চামড়ায়-বাঁধানো বৃহৎ খাতাটি খুলিয়া সেই পিঙ্গলবর্ণ বড়োসাহেবের রূঢ় লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতে থাকে। হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া সে কি এক মুহূর্তে আপনার বৃহৎ সংসারটিকে ডুবাইতে পারে। আমরা কি ইংরাজের মতো স্বতন্ত্র, সংসারভারবিহীন। আমরা প্রাণ দিতে উদ্যত হইলে অনেকগুলি নিরুপায় নারী, অনেকগুলি অসহায় শিশু ব্যাকুল বাহু উত্তোলন করিয়া আমাদের কল্পনাচক্ষে উদিত হয়। ইহা আমাদের বহুযুগের অভ্যাস।

সূচিপত্র

কিন্তু সে কথা ইংরাজের বুঝিবার নহে। ভাষায় একটিমাত্র কথা আছে– ভীরুতা। নিজের জন্য ভীরুতা ও পরের জন্য ভীরুতার প্রভেদ নির্ণয় করিয়া কোনো কথার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং ভীরু-শব্দটা মনে উদয় হইবামাত্র তৎসম্বলিত দৃঢ়-বদ্ধমূল অবজ্ঞাও মনে উদয় হইবে। আমরা বৃহৎ পরিবার ও বৃহৎ অপমান একত্রে মাথায় বহন করিতেছি।

তাহার পরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইংরাজি খবরের কাগজ আমাদের প্রতিকূলপক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে। চা রুটি এবং আণ্ডার সহিত আমাদের নিন্দাবাদ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ছোটোহাজরির অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যে ও গল্পে, ভ্রমণবৃত্তান্তে, ইতিহাসে, ভূগোলে, রাজনৈতিক প্রবন্ধে এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতায় ভারতবর্ষীয়ের, বিশেষত শিক্ষিত "বাবু'দের প্রতি ইংরাজের অরুচি উত্তরোত্তর বর্ধিত করিয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষীয়েরা আপন গরিবখানায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা কী প্রতিশোধ লইতে পারি। আমরা ইংরাজের কতটুকু ক্ষতি করিতে সক্ষম। আমরা রাগিতে পারি, ঘরে বসিয়া গাল পাড়িতে পারি, কিন্তু ইংরাজ যদি কেবলমাত্র দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা আমাদের কোমল কর্ণমূলে কিঞ্চিৎ কঠিন মর্দন প্রয়োগ করে তবে সেটা আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়। এইরূপ মর্দন করিবার ছোটো বড়ো কতপ্রকার অবসর যে তাহাদের আছে তাহা সদর- মফস্বলের লোকের অবিদিত নাই। ইংরাজ আমাদের প্রতি মনে মনে যতই বিমুখ বীতশ্রদ্ধ হইতে থাকিবে ততই আমাদের প্রকৃত স্বভাব বোঝা, আমাদের সুবিচার করা, আমাদের উপকার করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষীয়ের অবিশ্রাম নিন্দা ও তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইংরাজি কাগজ ভারতশাসনকার্য দুরূহ করিয়া

তুলিতেছে। আর, আমরা ইংরাজের নিন্দা করিয়া কেবল আমাদের নিরুপায় অসন্তোষ লালন করিতেছি মাত্র।

এ-পর্যন্ত ভারত-অধিকার-কার্যে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়ের নিকট হইতে ইংরাজের আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। দেড় শত বৎসর পূর্বেই যখন কারণ ছিল না বলিলেই হয়, তখন এখনকার তো আর কথাই নাই। রাজ্যের মধ্যে যাহারা উপদ্রব করিতে পারিত তাহাদের নখদন্ত গিয়াছে এবং অনভ্যাসে তাহারা এতই নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতরক্ষাকার্যের জন্যই সৈন্য পাওয়া ক্রমশ দুর্ঘট হইতেছে। তথাপি ইংরাজ “সিডিশন’-দমনের জন্য সর্বদা উদ্যত। তাহার কারণ, প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞগণ কোনো অবস্থাতেই সতর্কতাকে শিথিল হইতে দেন না। সাবধানের বিনাশ নাই।

তত্রাচ, উহা অতিসাবধানতা মাত্র। কিন্তু অপর পক্ষে ইংরাজ যদি ক্রমশই ভারতদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকে তাহা হইলেই রাজকার্যের বাস্তবিক বিঘ্ন ঘটা সম্ভব। বরং উদাসীনভাবেও কর্তব্যপালন করা যায়, কিন্তু আন্তরিক বিদ্বেষ লইয়া কর্তব্যপালন করা মনুষ্যক্ষমতার অতীত।

তথাপি অমানুষিক ক্ষমতাবলে সমস্ত কর্তব্য যথাযথ পালন করিলেও, সেই অন্তরস্থিত বিদ্বেষ প্রজাকে পীড়ন করিতে থাকে। কারণ, যেমন জলের ধর্ম আপনার সমতল সন্ধান করা তেমনি মানবহৃদয়ের ধর্ম আপনার সম-ঐক্য অন্বেষণ করা। এমন-কি, প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত সে আপনার ঐক্য স্থাপন করে। যেখানে সে আপনার ঐক্যের পথ খুঁজিয়া না পায় সেখানে অন্য যতপ্রকার সুবিধা থাক্, সে অতিশয় ক্লিষ্ট হইতে থাকে। মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য, আমাদের কলাবিদ্যা, আমাদের

বুদ্ধিবৃত্তিতে রাজায়-প্রজায় আদানপ্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত, কিন্তু অসম্মান করা তাহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসম্মানের কোনো লাঘব ছিল না, কারণ বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই অভিভূত হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা ইংরাজের রেলগাড়ি কলকারখানা রাজ্যশৃঙ্খলা দেখি আর হাঁ করিয়া ভাবি, ইহারা ময়দানবের বংশ। ইহারা এক জাতই স্বতন্ত্র, ইহাদের অসাধ্য কিছুই নহে- এই বলিয়া নিশ্চিন্তমনে রেলগাড়িতে চড়ি, কলের মাল সস্তায় কিনি এবং মনে করি, ইংরাজের মুল্লুকে আমাদের আর কিছু ভয় করিবার, চিন্তা করিবার, চেষ্টা করিবার নাই- কেবল, পূর্বে ডাকাতে যাহা লইত এখন তাহা পুলিস এবং উকিলে মিলিয়া অংশ করিয়া লয়।

এইরূপে মনের এক ভাগ যেরূপ নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট হয়, অপর ভাগে, এমন-কি, মনের গভীরতর মূলে, ভার বোধ হইতে থাকে। খাদ্যরস এবং পাকরস মিশিয়া তবে আহার পরিপাক হয়। ইংরাজের সভ্যতা আমাদের পক্ষে খাদ্যমাত্র, কিন্তু তাহাতে রসের একান্ত অভাব হওয়াতে আমাদের মন তদুপযুক্ত পাকরস নিজের মধ্য হইতে জোগাইতে পারিতেছে না। লইতেছি মাত্র, কিন্তু পাইতেছি না। ইংরাজের সকল কার্যের ফলভোগ করিতেছি কিন্তু আমার করিতে পারিতেছি না এবং করিবার আশাও নিরস্ত হইতেছে।

রাজ্য জয় করিয়া গৌরব এবং লাভ আছে, রাজ্য সুশাসন করিয়া ধর্ম এবং অর্থ আছে; আর রাজাপ্রজার হৃদয়ের মিলন স্থাপন করিয়া কি কোনো মাহাত্ম্য এবং কোনো সুবিধা নাই। বর্তমান কালের ভারত-রাজনীতির সেই কি সর্বাপেক্ষা চিন্তা এবং আলোচনার বিষয় নহে।

কেমন করিয়া হইবে তাহাই প্রশ্ন। একে একে তো দেখানো গিয়াছে যে রাজাপ্রজার মধ্যে দুর্ভেদ্য দুরূহ স্বাভাবিক বাধাসকল বর্তমান। কোনো কোনো

সহৃদয় ইংরাজও সেজন্য অনেকসময় চিন্তা ও দুঃখ অনুভব করেন। তবু যাহা অসম্ভব, যাহা অসাধ্য, তাহা লইয়া বিলাপ করিয়া ফল কী।

কিন্তু বৃহৎ কার্য, মহৎ অনুষ্ঠান কবে সহজ সুসাধ্য হইয়াছে। এই ভারতজয়-ভারতশাসনকার্যে ইংরাজের যে-সকল গুণের আবশ্যক হইয়াছে সেগুলি কি সুলভ গুণ। সে সাহস, সে অদম্য অধ্যবসায়, সে ত্যাগস্বীকার কি স্বল্প সাধনার ধন। আর, পঞ্চবিংশতি কোটি বিদেশীয় প্রজার হৃদয় জয় করিবার জন্য যে দুর্লভ সহৃদয়তাগুণের আবশ্যক তাহা কি সাধনার যোগ্য নহে।

ইংরাজ কবিগণ গ্রীস ইটালি হাঙ্গেরি পোলাণ্ডের দুঃখে অশ্রুমোচন করিয়াছেন। আমরা ততটা অশ্রুপাতের অধিকারী নহি, কিন্তু এ-পর্যন্ত মহাত্মা এড্‌বিন আর্নল্‌ড্‌ ব্যতীত আর কোনো ইংরাজ কবি কোনো প্রসঙ্গ উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি ব্যক্ত করেন নাই। বরঞ্চ শুনিয়াছি, নিঃসম্পর্ক ফ্রান্সের কোনো কোনো বড়ো কবি ভারতবর্ষীয় প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজের যতটা অনাত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর-কিছুতেই নহে।

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দের লইয়া আজকাল ইংরাজি নভেল অনেকগুলি বাহির হইতেছে। শুনিতে পাই, আধুনিক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাড্‌ইয়ার্ড্‌ কিপ্‌লিং প্রতিভায় অগ্রগণ্য। তাঁহার ভারতবর্ষীয় গল্প লইয়া ইংরাজ পাঠকেরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। উক্ত গল্পগুলি পড়িয়া তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত ইংরাজ কবির মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি। সমালোচনা উপলক্ষে এড্‌মণ্ড্‌ গস বলিতেছেন :

“এই-সকল গল্প পড়িতে পড়িতে ভারতবর্ষীয় সেনানিবাসগুলিকে জনহীন বালুকাসমুদ্রের মধ্যবর্তী এক-একটি দ্বীপের মতো বোধ হয়। চারি দিকেই ভারতবর্ষের অপরিসীম মরুময়তা- অখ্যাত, একঘেয়ে, প্রকাণ্ড। সেখানে কেবল কালা আদমি, পারিয়া কুকুর, পাঠান, এবং সবুজবর্ণ টিয়াপাখি, চিল এবং কুম্ভীর, এবং লম্বা ঘাসের নির্জন ক্ষেত্র। এই মরুসমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বীপে কতকগুলি যুবাপুরুষ বিধবা মহারানীর কার্য করিতে এবং তাঁহার অধীনস্থ পূর্বদেশীয় ধনসম্পদ্‌পূর্ণ বর্বর সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সুদূর ইংলণ্ড্ হইতে প্রেরিত হইয়াছে।”

ইংরাজের তুলিতে ভারতবর্ষের এই শুষ্ক শোভাহীন চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া মন নৈরাশ্যে বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষ তো এমন নয়। কিন্তু ইংরাজের ভারতবর্ষ কি এত তফাত।

পরন্তু ভারতবর্ষের সহিত স্বার্থসম্পর্কীয় সম্বন্ধ লইয়া প্রবন্ধ আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। ইংলণ্ডের জনসংখ্যা প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশ কী পরিমাণে খাদ্যাভাব হইতেছে এবং ভারতবর্ষ তাহা কী পরিমাণে পূরণ করিতেছে, এবং বিলাতি মালের আমদানি করিয়া বিলাতের বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর হাতে কাজ দিয়া তাহাদের কিরূপে জীবনোপায় করিয়া দিতেছে তাহার তালিকা বাহির হইতেছে।

ইংলণ্ড্ উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গোরুটির মতো দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কার রাখিতে এবং খোলবিচালি জোগাইতে কোনো আলস্য নাই, এই অস্থাবর সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয় সে পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখনো দৌরাত্ম্য করে সেজন্য শিংদুটা ঘষিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই, এবং দুই বেলা দুগ্ধ দোহন করিয়া লইবার সময় কৃশকায় বৎসগুলাকে একেবারে বঞ্চিত করে না। কিন্তু তবু স্বার্থের

সম্পর্কটাকেই উত্তরোত্তর জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা হইতেছে। এই-সকল প্রবন্ধে প্রায় একই সময় ভারতবর্ষের সহিত ইংরাজি উপনিবেশগুলিরও প্রসঙ্গ অবতারণা করা থাকে। কিন্তু সুরের কত প্রভেদ । তাহাদের প্রতি কত প্রেম, কত সৌভ্রাত্র। কত বারম্বার করিয়া বলা হয় যে, যদিও মাতৃভূমি হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে তথাপি এখনো মাতার প্রতি তাহাদের অচলা ভক্তি আছে, তাহারা নাড়ির টান ভুলিতে পারে নাই– অর্থাৎ সে স্থলে স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের কথারও উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। আর, হতভাগ্য ভারতবর্ষেরও কোথাও একটা হৃদয় আছে এবং সেই হৃদয়ের সঙ্গে কোথাও একটু যোগ থাকা আবশ্যক সে কথার কোনো আভাসমাত্র থাকে না। ভারতবর্ষ কেবল হিসাবের খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাতের দ্বারায় নির্দিষ্ট। ইংলণ্ডের প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকের কাছে ভারতবর্ষের কেবল মন-দরে সের-দরে, টাকার দরে, সিকার দরে, গৌরব। সংবাদপত্র এবং মাসিক-পত্রের লেখকগণ ইংলণ্ডকে কি কেবল এই শুষ্ক পাঠই অভ্যাস করাইবেন। ভারতবর্ষের সহিত যদি কেবল তাহার স্বার্থের সম্পর্কই দৃঢ় হয় তবে যে শ্যামাঙ্গিনী গাভীটি আজ দুধ দিতেছে কালে গোপকুলের অযথা বংশবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে তাহার লেজটুকু এবং ক্ষুরটুকু পর্যন্ত তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। এই স্বার্থের চক্ষে দেখা হয় বলিয়াই তো ল্যাঙ্কাশিয়র নিরুপায় ভারতবর্ষের তাঁতের উপর মাশুল বসাইয়াছে আর নিজের মাল বিনা মাশুলে চালান করিতেছে।

আমাদের দেশটাও যে তেমনি। যেমন রৌদ্র তেমনি ধুলা। কেবলই পাখার বাতাস এবং বরফ-জল না খাইলে সাহেব বাঁচে না। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে পাখার কুলিটিও রুগ্‌ণ প্লীহা লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, এবং বরফ সর্বত্র সুলভ নহে। ভারতবর্ষ ইংরাজের পক্ষে রোগশোক স্বজনবিচ্ছেদ এবং নির্বাসনের দেশ, সুতরাং খুব মোটা মাহিনায় সেটা পোষাইয়া লইতে হয়। আবার পোড়া এক্স্‌চেঞ্জ্‌ তাহাতেও বাদ সাধিতে চাহে। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ভারতবর্ষ ইংরাজকে কী দিতে পারে।

হায় হতভাগিনী ইণ্ডিয়া, তোমাকে তোমার স্বামীর পছন্দ হইল না, তুমি তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে না। এখন দেখো, যাহাতে তাহার সেবার ত্রুটি না হয়। তাহাকে অশ্রান্ত যত্নে বাতাস করো, খস্‌খসের পর্দা টাঙাইয়া জল সেচন করো, যাহাতে দুই দণ্ড তোমার ঘরে সে সুস্থির হইয়া বসিতে পারে। খোলো, তোমার সিন্ধুকটা খোলো, তোমার গহনাগুলো বিক্রয় করো, উদর পূর্ণ করিয়া আহার এবং পকেট পূর্ণ করিয়া দক্ষিণা দাও। তবু সে মিষ্ট কথা বলিবে না, তবু মুখ ভার করিয়া থাকিবে, তবু তোমার বাপের বাড়ির নিন্দা করিবে। আজকাল তুমি লজ্জার মাথা খাইয়া মান-অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ঝংকার-সহকারে দু-কথা পাঁচ-কথা শুনাইয়া দিতেছ। কাজ নাই বকাবকি করিয়া; যাহাতে তোমার বিদেশী স্বামী সন্তোষে থাকে, আরামে থাকে, একমনে তাহাই সাধন করো। তোমার হাতের লোহা অক্ষয় হউক।

ইংরাজ রাজকবি টেনিসন মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থে সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষকে কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়াছেন।

কবিবর উক্ত গ্রন্থে আকবরের স্বপ্ন-নামক একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। আকবর তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ আবুল ফজলের নিকট রাত্রের স্বপ্নবর্ণন উপলক্ষে তাঁহার ধর্মের আদর্শ ও জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্য এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে যে প্রেম ও শান্তি-স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন, স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তাঁহার পরবর্তীগণ সে চেষ্টা বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে এবং অবশেষে সূর্যাস্তের দিক হইতে একদল বিদেশী আসিয়া তাঁহার সেই ভূমিসাৎ মন্দিরকে একটি-একটি প্রস্তর গাঁথিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে; এবং সেই মন্দিরে সত্য এবং শান্তি, প্রেম এবং ন্যায়পরতা পুনরায় আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে।

কবির এই স্বপ্ন সফল হউক প্রার্থনা করি। আজ পর্যন্ত এই মন্দিরের প্রস্তরগুলি গ্রথিত হইয়াছে; বল পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহার কোনো ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু এখনো এ মন্দিরে সকল দেবতার অধিদেবতা প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

প্রেম-পদার্থটি ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে। আকবর সকল ধর্মের বিরোধভঞ্জন করিয়া যে-একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয়-মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত, নিষ্ঠার সহিত, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান পার্‌সি ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রিসভায়, হিন্দু বীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে, প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন। সূর্যাস্তভূমি হইতে বিদেশী আসিয়া আমাদের ধর্মে কোনো হস্তক্ষেপ করে না– কিন্তু সেই নির্লিপ্ততা প্রেম না রাজনীতি? উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।

কিন্তু একজন মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ যে অত্যুচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন একটি সমগ্র জাতির নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। সেইজন্য কবির স্বপ্ন কবে সত্য হইবে বলা কঠিন। বলা আরও কঠিন এইজন্য যে, দেখিতে পাইতেছি, রাজা-প্রজার মধ্যে যে চলাচলের পথ ছিল, উভয় পক্ষে কাঁটাগাছের ঘের দিয়া প্রতিদিন সে পথ মারিয়া লইতেছেন। নব নব বিদ্বেষ মিলনক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

রাজ্যের মধ্যে এই প্রেমের অভাব আমরা আজকাল এত অধিক করিয়া অনুভব করি যে, লোকের মনে ভিতরে ভিতরে একটা আশঙ্কা এবং অশান্তি

আন্দোলিত হইতেছে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, আজকাল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে, আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া কিরূপ বলা-কহা করি। আমরা কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ– ইংরাজরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না। তাহাদের রাজনীতির মধ্যে প্রেমনীতির স্থান নাই। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে। ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে;কিন্তু আকবর যে-একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড-ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইংরাজের পলিসির মধ্যে সেই আদর্শটি নাই বলিয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবিক বিরোধ হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। কেবল আইনের দ্বারা, শাসনের দ্বারা এক করা যায় না; অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, বেদনা বুঝিতে হয়, যথার্থ ভালোবাসিতে হয়– আপনি কাছে আসিয়া হাতে হাতে ধরিয়া মিলন করাইয়া দিতে হয়। কেবল পুলিস মোতাইন করিয়া এবং হাতকড়ি দিয়া শান্তিস্থাপন করায় দুর্ধর্ষ বলের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা ঠিক আকবরের স্বপ্নের মধ্যে ছিল না, এবং সূর্যাস্তভূমির কবিগণ অলীক অহংকার না করিয়া যদি বিনীত প্রেমের সহিত, সুগভীর আক্ষেপের সহিত, স্বজাতিকে লাঞ্ছনা করিয়া প্রেমের সেই উচ্চ আদর্শ শিক্ষা দেন তবে তাঁহাদের স্বজাতিরও উন্নতি হয় এবং এই আশ্রিতবর্গেরও উপকার হয়। ইংরাজের আত্মাভিমান সভ্যতাগর্ব জাত্যহংকার কি যথেষ্ট নাই। কবি কি কেবল সেই অগ্নিতেই আহুতি দিবেন। এখনো কি নম্রতা-শিক্ষা ও প্রেমচর্চার সময় হয় নাই। সৌভাগ্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিয়া এখনো কি ইংরাজ কবি কেবল আত্মঘোষণা করিবেন।

কিন্তু আমাদের মতো অবস্থাপন্ন লোকের মুখে এ-সকল কথা কেমন শোভন হয় না, সেইজন্য বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। দায়ে পড়িয়া প্রেম ভিক্ষা

করার মতো দীনতা আর কিছু নাই। এবং এ সম্বন্ধে দুই-এক কথা আমাদিগকে মাঝে মাঝে শুনিতেও হয়।

মনে পড়িতেছে, কিছুদিন হইল ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে লণ্ডনের স্পেক্টেটর পত্র বলিয়াছিলেন, নব্য বাঙালিদের অনেকগুলা ভালো লক্ষণ আছে; কিন্তু একটা দোষ দেখিতেছি, সিম্‌প্যাথি-লালসাটা তাহাদের বড়ো বেশি হইয়াছে।

এ দোষ স্বীকার করিতে হয় এবং এতক্ষণ আমি যেভাবে কথাগুলা বলিয়া আসিতেছি তাহাতে এ দোষ হাতে হাতে প্রমাণ হয়। ইংরাজের কাছ হইতে আদর পাইবার ইচ্ছাটা আমাদের কিছু অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, আমরা স্পেক্টেটরের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। আমরা যখন "তৃষার্ত হইয়া চাহি এক ঘটি জল' আমাদের রাজা তখন "তাড়াতাড়ি এনে দেয় আধখানা বেল'। আধখানা বেল সময়বিশেষে অত্যন্ত উপাদেয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই একসঙ্গে দূর হয় না। ইংরাজের সুনিয়মিত সুবিচারিত গবর্মেন্ট অত্যন্ত উত্তম এবং উপাদেয়, কিন্তু তাহাতে প্রজার হৃদয়ের তৃষ্ণা মোচন না হইতেও পারে, এমন-কি, গুরুপাক প্রচুর ভোজনের ন্যায় তদ্‌দ্বারা তৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেও আটক নাই। স্পেক্টেটর দেশদেশান্তরের সকলপ্রকার ভোজ্য এবং সকলপ্রকার পানীয় অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করিয়া পরিপূর্ণ ডিনারের মাঝখানে বসিয়া কিছুতেই ভাবিয়া পান না তাঁহাদের বাতায়নের বহিঃস্থিত পথপ্রান্তবর্তী ওই বিদেশী বাঙালিটির এমন বুভুক্ষু কাঙালের মতো ভাবখানা কেন।

কিন্তু স্পেক্টেটর শুনিয়া হয়তো সুখী হইবেন, অতিদুষ্প্রাপ্য তাঁহাদের সেই সিম্‌প্যাথির আঙুর ক্রমে আমাদের নিকটও টক হইয়া আসিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিবার

সূচিপত্র

উপক্রম করিতেছি। আমাদের এই চির-উপবাসী ক্ষুধিত স্বভাবের মধ্যেও যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল তাহা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে।

আমরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি– তোমরা এতই কি শ্রেষ্ঠ। তোমরা নাহয় কল চালাইতে এবং কামান পাতিতে শিখিয়াছ, কিন্তু মানবের প্রকৃত সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, সেই সভ্যতায় আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর। অধ্যাত্মবিদ্যার ক-খ হইতে আমরা তোমাদিগকে শিখাইতে পারি। তোমরা যে আমাদিগকে স্বল্পসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা কর সে তোমাদের অন্ধ মূঢ়তা-বশত। হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠতা ধারণা করিবার শক্তিও তোমাদের নাই। আমরা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিব। আজ হইতে তোমাদের য়ুরোপের সুখাসক্ত চপল সভ্যতার বাল্যলীলা হইতে সমস্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে কেবলমাত্র নাসাগ্রভাগে নিবিষ্ট করিয়া রাখিলাম। তোমরা কাছারি করো, আপিস করো, দোকান করো, নাচো খেলো, মারো ধরো, হুটোপাটি করো এবং সিমলার শৈলশিখরে বিলাসের স্বর্গপুরী নির্মাণ করিয়া সভ্যতামদে প্রমত্ত হইয়া থাকো।

দরিদ্র বঞ্চিত মানব আপনাকে এইরূপে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। যে শ্রেষ্ঠতার সহিত প্রেম নাই সে শ্রেষ্ঠতা সে কিছুতেই বহন করিতে সম্মত হয় না। কারণ, তাহার অন্তরে একটি সহজ জ্ঞান আছে, তদ্‌দ্বারা সে জানে যে, এইরূপ শুষ্ক শ্রেষ্ঠতা বাধ্য হইয়া বহন করিতে হইলে ক্রমশ ভারবাহী মূঢ় পশুর সমতুল্য হইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু কে বলিতে পারে, এই মানসিক বিদ্রোহই বিধাতার অভিপ্রেত নহে। তিনি ক্ষুদ্র পৃথিবীকে যেরূপ প্রচণ্ড সূর্যের প্রবল আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন– তাহার অন্তরে একটি প্রতিকূল শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই শক্তির বলে সে সূর্যের আলোক-উত্তাপ ভোগ করিয়াও আপনার স্বাতন্ত্র্য

রক্ষা করিতেছে এবং সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী হইবার চেষ্টা না করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত স্নেহশক্তি-দ্বারা শ্যামলা শস্যশালিনী কোমলা মাতৃরূপিণী হইয়া উঠিয়াছে- বিধাতা বোধ করি সেইরূপ আমাদিগকেও ইংরাজের বৃহৎ আকর্ষণের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছেন। বোধ করি তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা ইংরাজি সভ্যতার জ্ঞানালোকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিব।

তাহার লক্ষণও দেখা যায়। ইংরাজের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে যে-একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্‌দ্বারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের যে-সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা অন্ধ ও জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহারা নূতন আলোকে পুনরায় আপনাকে চিনিতে পারিতেছে। স্বাধীন যুক্তিতর্কবিচারে আমাদের মানসভূমি আমাদের নিকট নবাবিষ্কৃত হইতেছে। দীর্ঘ প্রলয়রাত্রির অবসানে অরুণোদয়ে যেন আমরা আমাদেরই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি। স্মৃতিশ্রুতি-কাব্যপুরাণ-ইতিহাসদর্শনের প্রাচীন গহন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি- পুরাতন গুপ্তধনকে নূতন করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা। আমাদের মনে যে একটা ধিক্‌কারের প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেই আমাদিগকে আমাদের নিজের দিকে পুনরায় সবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। প্রথম আক্ষেপে আমরা কিছু অন্ধভাবে আমাদের মাটি ধরিয়া পড়িয়াছি- আশা করা যায়, একদিন স্থিরভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে ভালোমন্দ- বিচারের সময় আসিবে এবং এই প্রতিঘাত হইতে যথার্থ গভীর শিক্ষা এবং স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারিব।

এক প্রকারের কালি আছে যাহা কাগজের গায়ে কালক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়, অবশেষে অগ্নির কাছে কাগজ ধরিলে পুনর্বার রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতা সেই কালিতে লেখা; কালক্রমে লুপ্ত হইয়া

যায়, আবার শুভদৈবক্রমে নব-সভ্যতার সংস্রবে নবজীবনের উত্তাপে তাহা পুনরায় ফুটিয়া উঠা অসম্ভব বোধ হয় না। আমরা তো সেইরূপ আশা করিয়া আছি। এবং সেই বিপুল আশায় উৎসাহিত হইয়া আমাদের সমুদয় প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলি সেই উত্তাপের কাছে আনিয়া ধরিতেছি– যদি পূর্ব অক্ষর ফুটিয়া উঠে তবেই পৃথিবীতে আমাদের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে– নচেৎ বৃদ্ধ ভারতের জরাজীর্ণ দেহ সভ্যতার জ্বলন্ত চিতায় সমর্পণ করিয়া লোকান্তর ও রূপান্তর -প্রাপ্তি হওয়াই সদ্‌গতি।

আমাদের মধ্যে সাধারণের সম্মানভাজন এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাঁহারা বর্তমান সমস্যার সহজ একটা মীমাংসা করিতে চান। তাঁহাদের ভাবখানা এই :

ইংরাজের সহিত আমাদের অনেকগুলি বাহ্য অমিল আছে। সেই বাহ্য অমিলই সর্বপ্রথম চক্ষে আঘাত করে এবং তাহা হইতেই বিজাতীয় বিদ্বেষের সূত্রপাত হইয়া থাকে। অতএব বাহ্য অনৈক্যটা যথাসম্ভব দূর করা আবশ্যক। যে-সমস্ত আচার-ব্যবহার এবং দৃশ্য চিরাভ্যাসক্রমে ইংরাজের সহজে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সেইগুলি দেশে প্রবর্তন করা দেশের পক্ষে হিতজনক। বসনভূষণ ভাবভঙ্গি, এমন-কি, ভাষাটা পর্যন্ত ইংরাজি হইয়া গেলে দুই জাতির মধ্যে মিলনসাধনের একটি প্রধান অন্তরায় চলিয়া যায় এবং আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার একটি সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়।

আমার বিবেচনায় এ কথা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নহে। বাহ্য অনৈক্য লোপ করিয়া দেওয়ার একটি মহৎ বিপদ এই যে, অনভিজ্ঞ দর্শকের মনে একটি মিথ্যা আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই আশাটি রক্ষা করিবার জন্য অলক্ষিতভাবে মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে হয়। ইংরাজদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয়, আমরা তোমাদেরই মতো, এবং যেখানে অন্যতর কিছু বাহির হইয়া পড়ে

সেখানে তাড়াতাড়ি যেন-তেন প্রকারে চাপাচুপি দিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। আডাম এবং ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বে যে সহজ বেশে ভ্রমণ করিতেন তাহা অতি শোভন ও পবিত্র, কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পরে যে-পর্যন্ত না পৃথিবীতে দর্জির দোকান বসিয়াছিল সে-পর্যন্ত তাঁহাদের বেশভূষা অশ্লীলতানিবারণী সভায় নিন্দার্হ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আমাদেরও নব-আবরণে লজ্জানিবারণ না করিয়া লজ্জাবৃদ্ধি করিবারই সম্ভব। কারণ, সমস্ত দেশটাকে ঢাকিবার মতো দর্জির এস্‌টাব্লিশ্‌মেণ্ট্ এখনো খোলা হয় নাই। ঢাকিতে গিয়া ঢাকা পড়িবে না এবং তাহার মতো বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। যাঁহারা লোভে পড়িয়া সভ্যতা-বৃক্ষের এই ফলটি খাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বড়োই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। পাছে ইংরাজ দেখিতে পায় আমরা হাতে করিয়া খাই, পাছে ইংরাজ জানিতে পায় আমরা আসনে চৌকা হইয়া বসি, এজন্য কেবলই তাঁহাদিগকে পর্দা টানিয়া বেড়াইতে হয়। এটিকেটশাস্ত্রে একটু ত্রুটি হওয়া, ইংরাজি ভাষায় স্বল্প স্খলন হওয়া তাঁহারা পাতকরূপে গণ্য করেন এবং স্বসম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সাহেবি আদর্শের ন্যূনতা দেখিলে লজ্জা ও অবজ্ঞা অনুভব করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে অনাবরণ অপেক্ষা এই অসম্পূর্ণ আবরণে, এই আবরণের নিষ্ফল চেষ্টাতেই প্রকৃত অশ্লীলতা- ইহাতেই যথার্থ আত্মাবমাননা।

কতকটা পরিমাণে ইংরাজি ছদ্মবেশ ধারণ করিলে বৈসাদৃশ্যটা আরো বেশি জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাহার ফলটা বেশ সুশোভন হয় না। সুতরাং রুচিতে দ্বিগুণ আঘাত দেয়। ইংরাজের মনটা অভ্যাসকুহকে নিকটে আকৃষ্ট হওয়াতেই আপনাকে অন্যায়-প্রতারিত জ্ঞান করিয়া দ্বিগুণ বেগে প্রতিহত হয়।

নব্য জাপান য়ুরোপীয় সভ্যতায় রীতিমতো দীক্ষিত হইয়াছে। তাহার শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা নহে। কলকারখানা শাসনপ্রণালী বিদ্যাবিস্তার সমস্ত সে নিজের হাতে চালাইতেছে। তাহার পটুতা দেখিয়া য়ুরোপ বিস্মিত হয় এবং

কোথাও কোনো ত্রুটি খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু তথাপি য়ুরোপ আপনার বিদ্যালয়ের এই সর্দার-পোড়োটিকে বিলাতি বেশভূষা-আচারব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিলেই বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না। জাপান নিজের এই অদ্ভুত কুরুচি, এই হাস্যজনক অসংগতি সম্বন্ধে নিজে একেবারেই অন্ধ। কিন্তু য়ুরোপ এই ছদ্মদেশী এশিয়াবাসীকে দেখিয়া বিপুল শ্রদ্ধা সত্ত্বেও না হাসিয়া থাকিতে পারে না।

আর আমরা কি য়ুরোপের সহিত অন্য সমস্ত বিষয়েই এতটা দূর একাত্ম হইয়া গিয়াছি যে, বাহ্য অনৈক্য বিলোপ করিয়া দিলে অসংগতি-নামক গুরুতর রুচিদোষ ঘটিবে না।

এই তো গেল একটা কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই উপায়ে লাভ চুলায় যাক, মূলধনেরই ক্ষতি হয়। ইংরাজের সহিত অনৈক্য তো আছেই, আবার স্বদেশীয়ের সহিত অনৈক্যের সূচনা হয়। আমি যদি আজ ইংরাজের মতো হইয়া ইংরাজের নিকট মান কাড়িতে যাই তবে আমার যে ভ্রাতারা ইংরাজের মতো সাজে নাই তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে স্বভাবতই কিছু সংকোচবোধ হয়ই। তাহাদের জন্য লজ্জা অনুভব না করিয়া থাকিবার জো নাই। আমি যে নিজগুণে ওই-সকল মানুষের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রজাতিভুক্ত হইয়াছি এইরূপ পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হয়।

ইহার অর্থই এই- জাতীয় সম্মান বিক্রয় করিয়া আত্মসম্মান ক্রয় করা। ইংরাজের কাছে একরকম করিয়া বলা যে, সাহেব, ওই বর্বরদের প্রতি যেমন ব্যবহারই কর, আমি যখন কতকটা তোমাদের মতো চেহারা করিয়া আসিয়াছি তখন মনে বড়ো আশা আছে যে, আমাকে তুমি দূর করিয়া দিবে না।

মনে করা যাক যে, এইরূপ কাঙালবৃত্তি করিয়া কিছু প্রসাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতেই কি আপনার কিম্বা স্বজাতির সম্মান রক্ষা করা হয়।

কর্ণ যখন অশ্বত্থামাকে বলেন যে, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত কী যুদ্ধ করিব, তখন অশ্বত্থামা বলিয়াছিলেন, আমি ব্রাহ্মণ সেই জন্যেই তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না! আচ্ছা, তবে আমার এই পইতা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

সাহেব যদি শেক্‌হ্যাণ্ড্‌পূর্বক বলে এবং এস্কোয়ার-যোজনা-পূর্বক লেখে যে, আচ্ছা, তুমি যখন তোমার জাতীয়ত্ব যথাসম্ভব ঢাকিয়া আসিয়াছ তখন এবারকার মতো তোমাকে আমাদের ক্লাবের সভ্য করা গেল, আমাদের হোটেলে স্থান দেওয়া গেল, এমন-কি, তুমি দেখা করিলে এক-আধবার তোমার "কল রিটার্ন" করা যাইতেও পারে- তবে কি তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরমসম্মানিত জ্ঞান করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিব, না বলিব- ইহারই জন্য আমার সম্মান! তবে এ ছদ্মবেশ আমি ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম; যতক্ষণে না আমার সমস্ত স্বজাতিকে আমি যথার্থ সম্মানযোগ্য করিতে পারিব ততক্ষণ আমি রঙ মাখিয়া এক্‌সেপ্‌শন সাজিয়া তোমাদের দ্বারে পদার্পণ করিব না।

আমি তো বলি, সেই আমাদের একমাত্র ব্রত। সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব; নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে তখন পৃথিবীর যে সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব- ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম, ছদ্মব্যবহার এবং যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগের কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

উপায়টা সহজ নহে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সহজ উপায়ে কোন্ দুঃসাধ্য কাজ হইয়াছে! বড়ো কঠিন কাজ; সেইজন্য অন্য-সমস্ত ফেলিয়া তাহারই প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে।

কার্যে প্রবৃত্ত হইবার আরম্ভে এই পণ করিয়া বসিতে হইবে যে, যতদিন-না সুযোগ্য হইব ততদিন অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়া থাকিব।

নির্মাণ হইবার অবস্থায় গোপনের আবশ্যক। বীজ মৃত্তিকার নিম্নে নিহিত থাকে, ভ্রূণ গর্ভের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বালককে সংসারে অধিক পরিমাণে মিশিতে দিলে সে প্রবীণ-সমাজের মধ্যে গণ্য হইবার দুরাশায় প্রবীণদিগের অযথা অনুকরণ করিয়া অকালপক্ক হইয়া যায়। সে মনে করে, সে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া গিয়াছে; তাহার আর রীতিমতো শিক্ষার প্রয়োজন নাই- বিনয় তাহার পক্ষে বাহুল্য।

পাণ্ডবেরা পূর্বগৌরব গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া বল সঞ্চয় করিয়াছেন। সংসারে উদ্‌যোগপর্বের পূর্বে অজ্ঞাতবাসের পর্ব।

আমাদেরও যখন আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণের অবস্থা, এখন আমাদের অজ্ঞাতবাসের সময়।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা বড়োই বেশি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নিতান্ত অপরিপক্ক অবস্থাতেই অধীরভাবে ডিম্ব ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি, এখন প্রতিকূল সংসারের মধ্যে এই দুর্বল অপরিণত শরীরের পুষ্টিসাধন বড়ো কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কী অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কী বর্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি। কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই-বা কাজ চলে এবং কতটুকুই-বা ফল হয়।

একবার নিজেদের মধ্যে অকপটচিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কী যে, এখনো আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই। আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারো নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদ্‌বুদের মতো ফাটিয়া যায়; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠে, দুইদিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ-না যথার্থ ত্যাগস্বীকারের সময় আসে ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মতো একটা উদ্‌যোগ লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকি, তার পরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান ছুতায় স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোনো কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ন হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কোনো জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হউক, কাজ আরম্ভ হইতে না-হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন রিপোর্ট ধুমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্ট পরিমাণে হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিদ্রালস হইয়া আসে; ধৈর্যসাধ্য শ্রমসাধ্য নিষ্ঠাসাধ্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না।

এই দুর্বল অপরিণত শতজীর্ণ চরিত্রটা লইয়া আমরা কী সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিস্ময় এবং ভাবনার বিষয়।

এরূপ অবস্থায় অসম্পূর্ণতা সংশোধন না করিয়া অসম্পূর্ণতা গোপন করিতেই ইচ্ছা যায়। একটা- কোনো আত্মদোষের সমালোচনা করিতে গেলেই সকলে মিলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে; বলে, আরে চুপ চুপ, ইংরাজেরা শুনিতে পাইবে- তাহারা কী মনে করিবে।

আবার আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজও অনেকগুলি বিষয়ে কিছু স্থূলদৃষ্টি । ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যে বিশেষ গুণগুলি আছে এবং যেগুলি বিশেষ

সমাদরের যোগ্য তাহা তাহারা তলাইয়া গ্রহণ করিতে পারে না; অবজ্ঞাভরেই হউক বা যে কারণেই হউক, তাহারা বিদেশী আবরণ ভেদ করিতে পারে না বা চাহে না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখো- বিদেশে থাকিয়া জর্মান যেমন একাগ্রতার সহিত আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছে স্বক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইংরাজ তেমন করে নাই। ইংরাজ ভারতবর্ষে জীবনযাপন করে এবং দেশটাকে সম্পূর্ণই দখল করিয়াছে কিন্তু দেশী ভাষাটা দখল করিতে পারে নাই।

অতএব ইংরাজ ভারতবর্ষীয়কে ঠিক ভারতবর্ষীয়ভাবে বুঝিতে এবং শ্রদ্ধা করিতে অক্ষম। এইজন্য আমরা অগত্যা ইংরাজকে ইংরাজি-ভাবেই মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। মনে যাহা জানি মুখে তাহা বলি না, কাজে যাহা করি কাগজে তাহা বাড়াইয়া লিখি। জানি যে ইংরাজ পীপ্‌ল্‌-নামক একটা পদার্থকে জুজুর মতো দেখে, আমরাও সেইজন্য কোনোমতে পাঁচজনকে জড়ো করিয়া পীপ্‌ল্‌ সাজিয়া গলা গম্ভীর করিয়া ইংরাজকে ভয় দেখাই। পরস্পরকে বলি, কী করিব ভাই, এমন না করিলে উহারা যদি কোনো কথায় কর্ণপাত না করে তবে কী করা যায়। উহারা কেবল নিজের দস্তুরটাই বোঝে।

এইরূপে ইংরাজের স্বভাবগুণেই আমাদিগকে ইংরাজের মতো ভান করিয়া, আড়ম্বর করিয়া, তাহাদের নিকট সম্মান এবং কাজ আদায় করিতে হয়। কিন্তু তবু আমি বলি, সর্বাপেক্ষা ভালো কথা এই যে, আমরা সাজিতে পারিব না। না সাজিলে কর্তারা যদি আমাদিগকে একটুখানি অধিকার বা আধ-টুকরা অনুগ্রহ না দেন তো নাই দিলেন।

কর্তৃপক্ষের প্রতি অভিমান করিয়া যে এ কথা বলা হইতেছে তাহা নহে। মনে বড়ো ভয় আছে- আমরা মৃৎপাত্র; কাংস্যপাত্রের সহিত বিবাদ চুলায় যাউক, আত্মীয়তাপূর্বক শেক্‌হ্যাণ্ড্‌ করিতে গেলেও আশঙ্কার সম্ভাবনা জন্মে।

কারণ, এত অনৈক্যের সংঘাতে আত্মরক্ষা করা বড়ো কঠিন। আমরা দুর্বল বলিয়াই ভয় হয় যে, সাহেবের কাছে যদি একবার ঘেঁষি- সাহেব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি কিছু সুপ্রসন্ন হাস্য বর্ষণ করে- তাহার প্রলোভন আমার কাছে বড়ো বেশি; এত বেশি যে, সে অনুগ্রহের তুলনায় আমাদের যথার্থ হিত আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি। সাহেব যদি হাসিয়া বলিয়া বসে, বাঃ বাবু, তুমি তো ইংরাজি মন্দ বল না, তাহার পর হইতে বাংলার চর্চা করা আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইয়া উঠে। যে বহিরংশে ইংরাজের অনুগ্রহদৃষ্টি পড়ে সেই অংশেরই চাকচিক্যসাধনে প্রবৃত্তি হয়, যে দিকটা য়ুরোপের চক্ষুগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই সে দিকটা অন্ধকারে অনাদরে আবর্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সে দিকের কোনোরূপ সংশোধনে হাত দিতে আলস্য বোধ হয়।

মানুষকে দোষ দিতে পারি না; অকিঞ্চন অপমানিতের পক্ষে এ প্রলোভন বড়ো স্বাভাবিক- সৌভাগ্যবানের প্রসন্নতায় তাহাকে বিচলিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আজ আমি বলিতেছি, ভারতবর্ষের দীনতম মলিনতম কৃষককেও আমি ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, আর ওই-যে রাঙা সাহেব টম্‌টম্‌ হাঁকাইয়া আমার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটাইয়া চলিয়া যাইতেছে উহার সহিত আমার কানাকড়ির সম্পর্ক নাই।

ঠিক এমন সময়টিতে যদি উক্ত রাঙা সাহেব হঠাৎ টম্‌টম্‌ থামাইয়া আমারই দরিদ্র কুটিরে পদার্পণ করিয়া বলে, বাবু, তোমার কাছে দেশালাই আছে, তখন ইচ্ছা করে- দেশের পঞ্চবিংশতি কোটি লোক সারি সারি কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া যায় যে, সাহেব আজ আমারই বাড়িতে দেশালাই চাহিতে আসিয়াছে। এবং দৈবাৎ ঠিক সেই সময়টিতে যদি আমার দীনতম

সূচিপত্র

মলিনতম কৃষকভাইটি মা-ঠাকরুনকে প্রণাম করিবার জন্য আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই কুৎসিত দৃশ্যটিকে ধরণীতলে বিলুপ্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা করে, পাছে সেই বর্বরের সহিত আমার কোনো যোগ, কোনো সংস্রব, কোনো সুদূর ঐক্য বড়োসাহেবের কল্পনাপথে উদিত হয়।

অতএব, যখন মনে মনে বলি সাহেবের কাছে আর ঘেঁষিব না তখন অহংকারের সহিত বলি না, বড়ো বিনয়ের সহিত, বড়ো আশঙ্কার সহিত বলি। জানি যে, সেই সৌভাগ্যগর্বেই আমার সর্বাপেক্ষা সর্বনাশ হইবে- আমি আর নিভৃতে বসিয়া আপনার কর্তব্যপালন করিতে পারিব না, মনটা সর্বদাই উড়ু-উড়ু করিতে থাকিবে এবং আপনাদের দরিদ্র স্বজনের খ্যাতিহীন গৃহটাকে বড়োই বেশি শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। যাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আমার কর্তব্য তাহাদের সহিত নিকট-আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করিতে আমার লজ্জা বোধ হইবে।

ইংরাজ তাহাদের আমোদপ্রমোদ আহারবিহার আসঙ্গপ্রসঙ্গ বন্ধুত্বপ্রণয় হইতে আমাদিগকে সর্বতোভাবে বহিষ্কৃত করিয়া দ্বার রুদ্ধ রাখিতে চাহে; তবু আমরা নত হইয়া, প্রণত হইয়া, ছল করিয়া, কল করিয়া একটুখানি প্রবেশাধিকার পাইলে, রাজ-সমাজের একটু ঘ্রাণমাত্র পাইলে এত কৃতার্থ হই যে, আপনার দেশের লোকের আত্মীয়তা সে গৌরবের নিকট তুচ্ছ বোধ হয়। এমন স্থলে, এমন দুর্বল মানসিক অবস্থায় সেই সর্বনাশী অনুগ্রহমদ্যকে অপেয়মস্পর্শং বলিয়া সর্বথা পরিহার করাই কর্তব্য।

আরো একটা কারণ আছে। ইংরাজের অনুগ্রহকে কেবল গৌরব মনে করিয়া কেবল নিঃস্বার্থভাবে ভোগ করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। কারণ আমরা দরিদ্র, এবং জঠরানল কেবল সম্মানবর্ষণে শান্ত হয় না। আমরা অনুগ্রহটিকে সুবিধায় ভাঙাইয়া লইতে চাহি। কেবল অনুগ্রহ নহে, সেইসঙ্গে

কিছু অন্নেরও প্রত্যাশা রাখি। কেবল শেক্‌হ্যাণ্ড্ নহে, চাকরিটা বেতনবৃদ্ধিটাও আবশ্যক। প্রথম দুই দিন যদি সাহেবের কাছে বন্ধুর মতো আনাগোনা করি তো তৃতীয় দিন ভিক্ষুকের মতো হাত পাতিতে লজ্জা বোধ করি না। সুতরাং সম্বন্ধটা বড়োই হীন হইয়া পড়ে। এ দিকে অভিমান করি যে, ইংরাজ আমাদিগকে সমকক্ষ- ভাবের সম্মান দেয় না; ও দিকে তাহাদের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা করিতেও ছাড়ি না।

ইংরাজ আমাদের দেশি সাক্ষাৎকারীকে উমেদার, অনুগ্রহপ্রার্থী অথবা টাইটেল-প্রত্যাশী না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ইংরাজের সঙ্গে তো আমাদের দেখাশুনার কোনো সম্বন্ধই নাই। তাহাদের ঘরের দ্বার রুদ্ধ, আমাদের কপাটে তালা। তবে আজ হঠাৎ ওই-যে লোকটা পাগড়ি-চাপকান পরিয়া শঙ্কিতগমনে আসিতেছে, অপ্রস্তুত অভদ্রের মতো অনভ্যস্ত অশোভন ভাবে সেলাম করিতেছে, কোথায় বসিবে ভাবিয়া পাইতেছে না এবং থতমত খাইয়া কথা কহিতেছে, উহার সহসা এত বিরহবেদনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল যে, দ্বারীকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়াও সাহেবের মুখচন্দ্রমা দেখিতে আসিয়াছে।

যাহার অবস্থা হীন সে যেন বিনা আমন্ত্রণে, বিনা আদরে, সৌভাগ্যশালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে না যায়- তাহাতে কোনো পক্ষেরই মঙ্গল হয় না। ইংরাজ এ দেশে আসিয়া ক্রমশই নূতন মূর্তি ধারণ করিতে থাকে- তাহার অনেকটা কি আমাদেরই হীনতাবশত নহে। সেইজন্যও বলি, অবস্থা যখন এতই মন্দ তখন আমাদের সংস্রব সংঘর্ষ হইতে ইংরাজকে রক্ষা করিলে উহাদেরও চরিত্রের এমন দ্রুত বিকৃতি হইবে না। সে উভয় পক্ষেরই লাভ।

অতএব, সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া রাজাপ্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে, ইংরাজ হইতে দূরে থাকিয়া

আমাদের নিকটকর্তব্য-সকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি, ইংরাজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনো দেখিব, অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না- বরং, যতদিন না পাইয়াছি ততদিন যে সান্ত্বনাটুকু ছিল সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না। আমাদের অন্তরে শূন্যতা না পুরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত, সম্মানের সহিত, রাজসাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।

আমি এমন বাতুল নহি যে আশা করিব, সমস্ত ভারতবর্ষ পদচিন্তা প্রভাবচিন্তা ইংরাজের প্রসাদ চিন্তা ত্যাগ করিয়া, বাহ্য আস্ফালন বাহ্য যশ-খ্যাতি পরিহার করিয়া, ইংরাজ-আকর্ষণের প্রবল মোহ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া নিবিষ্টমনে অবিচলিতচিত্তে চরিত্রবল সঞ্চয় করিবে, জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জন করিবে, স্বাধীন বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে, পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া লোকব্যবহার শিক্ষা করিবে, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সত্যাচরণ সত্যানুষ্ঠান প্রচার করিবে, মানুষ যেমন আপন মস্তক সহজে বহন করে তেমনি অনায়াসে স্বভাবতই আপনার সম্মান ঊর্ধ্বে বহন করিয়া রাখিবে, লালায়িত লোলজিহ্বায় পরের কাছে মান যাচ্ঞা করিতে যাইবে না এবং “ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ’ এই কথাটির সুগভীর তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে। এ কথা সুবিদিত যে, সুবিধার ঢাল যে দিকে, মানুষ অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সেই দিকে গড়াইয়া যায়। যদি হ্যাট-কোট পরিয়া ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিয়া, ইংরাজের দ্বারস্থ হইয়া, ইংরাজিতে নিজেকে বড়ো বড়ো অক্ষরে তর্জমা করিয়া কোনো সুবিধা থাকে তবে অল্পে অল্প লোকে হ্যাট-কোট ধরিবে, সন্তানদিগকে বহুচেষ্টায়

বাংলা ভুলিতে দিবে এবং নিজের পিতা-ভ্রাতার অপেক্ষা সাহেবের দ্বারবান-মহলে বেশি আত্মীয়তা স্থাপন করিবে। এ প্রবাহ রোধ করা দুঃসাধ্য।

দুঃসাধ্য, তবু মনের আক্ষেপ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। যদি অরণ্যে- রোদনও হয় তবু বলিতে হইবে যে, ইংরাজি ফলাইয়া কোনো ফল নাই, স্বভাষায় শিক্ষার মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি; ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোনো ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব; অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি।

শিখদিগের শেষ গুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া, নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতিসাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে; পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে; সমস্ত দেশ অনিবার্যবেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্ট রূপে হিতাহিতজ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে। তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, তখন আর-কিছু না হউক, সহসা চৈতন্য হইবে- এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সংকটের পথে চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা।

আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই। তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না; তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত হইতে, আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; কোনো-একটি বিশেষ আইন সংশোধন করিয়া বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের কোনো যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারি দিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন, এবং বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায় উদ্দেশ্যসাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এ দেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্যসাধনই তাঁহার ব্রত।

১৩০০

রাজনীতির দ্বিধা

সাধারণত ন্যায়পরতা দয়া প্রভৃতি অনেক বড়ো বড়ো গুণ আপন সমকক্ষ লোকদের মধ্যে যতটা স্ফূর্তি পায়, অসমকক্ষ লোকদের মধ্যে ততটা স্ফূর্তি পায় না। এমন অনেক দেখা যায়, যাঁহারা আপনার সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে গৃহপালিত মৃগশিশুর মতো মৃদুস্বভাব তাঁহারাই নিম্নশ্রেণীয়দের নিকট ডাঙার বাঘ, জলের কুম্ভীর এবং আকাশের শ্যেনপক্ষিবিশেষ।

য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য, যত সদয়, যত ন্যায়পর, বাহিরে ততটা নহে, এ-পর্যন্ত ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাহারা খৃস্টানদের নিকট খৃস্টান, অর্থাৎ গালে চড় খাইলে সময়বিশেষে অন্য গালটিও ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়, তাহারাই স্থানান্তরে গায়ে পড়িয়া অখৃস্টানের এক গালে চড় মারিয়া তাহাকে অন্য গাল ফিরাইতে বলে এবং অখৃস্টান যদি দুর্বুদ্ধিবশত উক্ত অনুরোধ- পালনে ইতস্তত করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কান ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া তাহার ঘরের মধ্যে নিজের চৌকি টেবিল ও ক্যাম্প্‌খাট আনিয়া হাজির করে, তাহার শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লয়, তাহার স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করে, তাহার গাভীগুলা হইতে দুগ্ধ দোহন করে এবং তাহার বাছুরগুলা কাটিয়া বাবুর্চিখানায় বোঝাই করিতে থাকে।

সভ্য খৃস্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অস্ট্রেলিয়ায় কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি-যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, অখৃস্টানের গালে খৃস্টানি চড় কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

সূচিপত্র

সমস্ত সংবাদ পুরাপুরি পাওয়া যায় না, এবং যাহা পাওয়া যায় তাহার যে সমস্তই সত্য তাহাতেও সন্দেহ আছে; কারণ, যুদ্ধ-সংবাদের টেলিগ্রাম-রচনার ভার উক্ত খৃষ্টানের হাতে। ট্রুথ-নামক বিখ্যাত ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়েকটি পত্র ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পাঠ করিয়া যে কেহ বিশেষ আশ্বস্ত হইবেন বা আনন্দ লাভ করিবেন এরূপ আশা দিতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝিতে পারিবেন, সভ্য জাতি যাহাকে আপনার অপেক্ষা অল্প সভ্য জ্ঞান করে তাহার নিকট আপন সভ্যতাকে এবং সেইসঙ্গে সেই অসভ্যটাকে বলিদান করিতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। উনিশ শত বৎসরের চিরসঞ্চিত সভ্যনীতি য়ুরোপীয় আলোকিত নাট্যমঞ্চের বাহিরে অন্ধকার নেপথ্যদেশে ক্ষণপরিহিত ছদ্মবেশের মতো খসিয়া পড়ে; এবং সেখানে যে আদিম উলঙ্গ মানুষ বাহির হইয়া পড়ে উলঙ্গ ম্যাটাবিলি তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে।

কিছু সসংকোচে বলিলাম- নিকৃষ্টতর নহে; নির্ভয়ে সত্য বলিতে গেলে- অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর। বর্বর লবেঙ্গ্যুলা ইংরাজদের প্রতি ব্যবহারে যে উদারতা এবং উন্নত বীরহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে ইংরাজদের ক্রূর ব্যবহার তাহার নিকট লজ্জায় ম্লান হইয়া রহিয়াছে, ইংরাজের পত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

কোনো ইংরাজ যে সে কথা স্বীকার করে ইহাই অনেকে ইংরাজের গৌরব বলিয়া মনে করিবেন এবং আমিও তাহা করি। কিন্তু আজকাল ইংরাজের মধ্যে অনেকে সেটাকে গৌরব বলিয়া জ্ঞান করে না।

তাহারা মনে করে, ধর্মনীতি আজকাল বড়ো বেশি সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। পদে পদে এত খুঁতখুঁত করিলে কাজ চলে না। ইংরাজের যখন গৌরবের মধ্যাহ্নকাল ছিল তখন নীতির সূক্ষ্ম গণ্ডিগুলা এক লম্ফে সে উল্লঙ্ঘন

করিতে পারিত। যখন আবশ্যক তখন অন্যায় করিতে হইবে। নর্মান দস্যু যখন সমুদ্রে সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত তখন তাহারা সুস্থ সবল ছিল, এখন তাহার যে ইংরাজ বংশধর ভিন্নজাতির প্রতি জবরদস্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় সে দুর্বল, রুগ্‌ণপ্রকৃতি। কিসের ম্যাটাবিলি, কেই-বা লবেঙ্গ্যুলা। আমি ইংরাজ, আমি তোমার সোনার খনি, তোমার গোরুর পাল লুঠিতে ইচ্ছা করি- ইহার জন্য এত ছুতা এত ছল কেন, মিথ্যা সংবাদই বা কেন বানাই, আর দুটো-একটা দুরন্তপনা ধরা পড়িলেই বা এত উচ্চৈঃস্বরে কাগজে পরিতাপ করিতে বসি কেন।

কিন্তু বালককালে যাহা শোভা পায়, বয়সকালে তাহা শোভা পায় না। একটা দুরন্ত লুব্ধ বালক নিজের অপেক্ষা ছোটো এবং দুর্বলতর বালকের হাতে মোওয়া দেখিলে কাড়িয়া ছিঁড়িয়া লুটপাট করিয়া লইয়া এক মুহূর্তে মুখের মধ্যে পুরিয়া বসে, হৃতমোদক অসহায় শিশুর ক্রন্দন দেখিয়াও কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয় না। এমন-কি, হয়তো ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া সবলে তাহার ক্রন্দন থামাইয়া দিতে চেষ্টা করে এবং অন্যান্য বালকেরাও মনে মনে তাহার বাহুবল ও দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসা করিতে থাকে।

বয়সকালেও সেই বলবানের যদি অসংযত লোভ থাকে তবে সে আর চড় মারিয়া মোওয়া লয় না, ছল করিয়া লয়, এবং যদি ধরা পড়ে তো কিছু অপ্রতিভ হয়। তখন সে আর পরিচিত প্রতিবেশীর ঘরে হাত বাড়াইতে সাহস করে না; দূরে কোনো দরিদ্রপল্লীর অসভ্য মাতার উলঙ্গ শীর্ণ সন্তানের হস্তে যখন তাহার এক সন্ধ্যার একমাত্র উপজীব্য খাদ্যখণ্ডটুকু দেখে, চারি দিকে চাহিয়া গোপনে ছোঁ মারিয়া লয় এবং যখন তাহার ক্রন্দনে গগনতল বিদীর্ণ হইতে থাকে তখন সমাগত স্বজাতীয় পান্থদের প্রতি চোখ টিপিয়া বলে, এই অসভ্য কালো ছোকরাটাকে আচ্ছা শাসন করিয়া দিয়াছি। কিন্তু স্বীকার করে না যে, ক্ষুধা পাইয়াছিল তাই কাড়িয়া খাইয়াছি।

পুরাকালের দস্যুবৃত্তির সহিত এই অধুনাতন কালের চৌর্যবৃত্তির অনেক প্রভেদ আছে। এখনকার অপহরণ-ব্যাপারের মধ্যে পূর্বকালের সেই নির্লজ্জ অসংকাচে বলদর্প থাকিতেই পারে না। এখন নিজের কাজের সম্বন্ধে নিজের চেতনা জন্মিয়াছে, সুতরাং এখন প্রত্যেক কাজের জন্য বিচারের দায়িক হইতে হয়। তাহাতে কাজও পূর্বের মতো তেমন সহজে সম্পন্ন হয় না এবং গালিও খাইতে হয়। পুরাতন দস্যু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার আবির্ভাব নিতান্ত অসাময়িক হইয়া পড়ে।

সমাজে এরূপ অসাময়িক আবির্ভাব সর্বদা ঘটিয়া থাকে। দস্যু বিস্তর জন্মে, কিন্তু সহসা তাহাদিগকে চেনা যায় না- অকালে অস্থানে পড়িয়া তাহারা অনেক সময় আপনাদিগকেও চেনে না। এ দিকে তাহারা গাড়ি চড়িয়া বেড়ায়, সংবাদপত্র পড়ে, হুইস্ট খেলে, স্ত্রীসমাজে মধুরালাপ করে- কেহ সন্দেহমাত্র করে না যে, এই সাদা কামিজ কালো কোর্তার মধ্যে রবিনহুডের নব অবতার ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

য়ুরোপের বাহিরে গিয়া ইহারা সহসা পূর্ণশক্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধর্মনীতির-আবরণ-মুক্ত সেই উৎকট রুদ্র মূর্তির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু য়ুরোপের সমাজ-মধ্যেই যে-সমস্ত ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গার আছে তাহাদেরও উত্তাপ বড়ো অল্প নহে।

ইহারাই আজকাল বলিতেছে, বলনীতির সহিত প্রেমনীতিকে যোগ করিলে নীতির নীতিত্ব বাড়িতে পারে, কিন্তু বলের বলত্ব কমিয়া যায়। প্রেম দয়া এ-সব কথা শুনিতে বেশ, কিন্তু যেখানে আমরা রক্তপাত করিয়া আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি সেখানে যে নীতিদুর্বল নবশতাব্দীর সুকুমারহৃদয় শিশু- সেন্টিমেণ্টের অশ্রুপাত করিতে আসে তাহাকে আমরা অন্তরের সহিত

ঘৃণা করি। এখানে সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা এবং শিষ্টাচার, সেখানে উলঙ্গ তরবারি এবং অসংকোচ একাধিপত্য।

এইজন্য আমাদের কর্তৃজাতীয়দের মধ্য হইতে আজকাল দুই সুরের গলা শুনা যায় । একদল প্রবলতার পক্ষপাতী, আর- একদল প্রেম এবং শান্তি এবং সুবিচার জগতে বিস্তার করিতে চাহে।

জাতির হৃদয় এইরূপে বিভক্ত হইয়া গেলে বলের খর্বতা হয়- আপনি আপনাকে বাধা দিতে থাকে। আজকাল ভারতবর্ষীয় ইংরাজ- সম্প্রদায় ইহাই লইয়া সুতীব্র আক্ষেপ করে। তাহারা বলে, আমরা কিছু জোরের সহিত যে কাজটা করিতে চাই, ইংলণ্ডীয় ভ্রাতারা তাহাতে বাধা দিয়া বসে, সকল কথাতেই নৈতিক কৈফিয়ত দিতে হয়। যখন দস্যু ব্লেক সমুদ্রদিগ্‌বিজয় করিয়া বেড়াইত, যখন ক্লাইব ভারতভূমিতে বৃটিশ ধ্বজা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল, তখন নীতির কৈফিয়ত দিতে হইলে ঘরের বাহিরে ইংরাজের ছেলের এক ছটাক জমি মিলিত না।

কিন্তু এমন করিয়া যতই বিলাপ কর, কিছুতেই আর সেই অখণ্ড দোর্দণ্ড বলের বয়সে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। এখন কোনো জুলুমের কাজ করিতে বসিলেই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটা দ্বিধা উপস্থিত হইবে। এখন যদি কোনো নিপীড়িত ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে তবে স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকিলেও নিদেন গুটিকতক লোকও তাহার সদ্‌বিচার করিতে উদ্যত হইবে। এখন একজন ব্যক্তিও যদি ন্যায়ের দোহাই দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তবে প্রবল স্বার্থপরতা হয় লজ্জায় কিঞ্চিৎ সংকুচিত হইয়া পড়ে, নয় ন্যায়েরই ছদ্মবেশ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। অন্যায় অনীতি যখন বলের সহিত আপনাকে অসংকোচে প্রকাশ করিত তখন বল ব্যতীত তাহার আর-কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কিন্তু যখনই সে আপনাকে আপনি গোপন করিতে চেষ্টা করে এবং

বলের সহিত আপন কুটুম্বিতা অস্বীকার করিয়া ন্যায়কে আপন পক্ষে টানিয়া বলী হইতে চায় তখনই সে আপনি আপনার শত্রুতা সাধন করে। এইজন্য বিদেশে ইংরাজ আজকাল কিঞ্চিৎ দুর্বল এবং সেজন্য সে সর্বদা অধৈর্য প্রকাশ করে।

আমরাও সেইজন্য ইংরাজের দোষ পাইলে তাহাকে দোষী করিতে সাহসী হই। সেজন্য ইংরাজ প্রভুরা কিছু রাগ করে। তাহারা বলে, নবাব যখন যথেচ্ছাচারী ছিল, বর্গি যখন লুটপাট করিত, ঠগি যখন গলায় ফাঁসি লাগাইত, তখন তোমাদের কন্‌গ্রেসের সভাপতি এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিল কোথায়। কোথাও ছিল না এবং থাকিলেও কোনো ফল হইত না। তখন গোপন বিদ্রোহী ছিল, মারহাট্টা এবং রাজপুত ছিল, তখন বলের বিরুদ্ধে বল ছাড়া গতি ছিল না। তখন চোরার নিকট ধর্মের কাহিনী উত্থাপন করিবার কথা কাহারো মনেও উদয় হইত না।

আজ যে কন্‌গ্রেস এবং সংবাদপত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহার কারণই এই যে, ইংরাজের মধ্যে অখণ্ড বলের প্রাদুর্ভাব নাই। এখন চোরকে ধর্মের কাহিনী বলিলে যদি-বা সে না মানে তবু তার একটা ধর্মসংগত জবাব দিতে চেষ্টা করে এবং ভালো জবাবটি দিতে না পারিলে তেমন বলের সহিত কাজ করিতে পারে না। অতএব, যে-সকল ইংরাজ ভারতবর্ষীয় সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের বাহুল্যবিস্তারে আক্ষেপ প্রকাশ করে তাহারা যথার্থপক্ষে স্বদেশীয়দের জাতীয় প্রকৃতিতে ধর্মবুদ্ধির অস্তিত্ব লইয়া দুঃখ করে। তাহারা যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যে নিজের ত্রুটির জন্য নিজে লজ্জিত হইতে শিখিয়াছে, ইহাই তাহাদের নিকট শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়।

এক হিসাবে ইহার মধ্যে কতকটা শোচনীয়তা আছে। এ দিকে ক্ষুধার জ্বালাও নিবারণ হয় নাই, ও দিকে পরের অন্নও কাড়িতে পারিব না, এ এক

বিষম সংকট। জাতির পক্ষে নিজের জীবনরক্ষা এবং ধর্মরক্ষা উভয়ই পরমাবশ্যক। পরের প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে যে পরের ক্ষতি হয় তাহা নহে, নিজেদের ধর্মের আদর্শ ক্রমশ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। দাসদের প্রতি যাহারা অত্যাচার করে তাহারা নিজের চরিত্র ধ্বংস করে। ধর্মকে সর্বপ্রযত্নে বলবান না রাখিলে আপনাদের মধ্যে জাতীয় বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, পেট ভরিয়া খাইতেও হইবে। ক্রমে বংশবৃদ্ধি ও স্থানাভাব হইতেছে, এবং সভ্যতার উন্নতি-সহকারে জীবনের আবশ্যক উপকরণ অতিরিক্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।

অতএব পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক্, মোটা-বেতনের ইংরাজ কর্মচারীকে এক্স্‌চেঞ্জের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সেইজন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্যদ্রব্যে মাশুল বসানো আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি ল্যাঙ্কাশিয়রের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় তবে তুলার উপর মাশুল বসানো যাইতে পারে। তৎপরিবর্তে বরঞ্চ পব্‌লিক ওয়াক্p্ কিছু খাটো করিয়া এবং দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড্ বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।

এক দিকে ইংরাজ কর্মচারীদিগেরও কষ্ট চক্ষে দেখা যায় না, অপর দিকে ল্যাঙ্কাশিয়রের ক্ষতিও প্রাণে সহ্য হয় না। এ দিকে আবার পঞ্চবিংশতি কোটি হতভাগ্যের জন্য যে কিছুমাত্র দুঃখ হয় না তাহাও নহে। ধর্মনীতি এমন সংকটেও ফেলে!

অমনি খবরের কাগজে ঢাক বাজিয়া যায়, আহতনীড় পক্ষিসমাজের ন্যায় সভাস্থলে কর্ণবধির কলকলধ্বনি উত্থিত হয়, ইংরাজ ভারি চটিয়া উঠে।

যখন কাজটা ন্যায়সংগত হইতেছে না বলিয়া মন বলিতেছে, অথচ না করিয়াও এড়াইবার জো নাই, সেই সময়ে ধর্মের দোহাই পাড়িতে থাকিলে

বিষম রাগ হয়। তখন রিক্তহস্তে কোনো যুক্তি-অস্ত্র না থাকাতে একেবারে ঘুষি মারিতে ইচ্ছা করে। কেবল মানুষটা নহে, ধর্মশাস্ত্রটার উপরেও দিক ধরিয়া যায়।

ভারত-মন্ত্রিসভার সভাপতি এবং অনেক মাতব্বর সভ্য ভাবগতিকে বলিয়াছেন যে, কেবল ভারতবর্ষের নহে, সমস্ত ইংরাজ-রাজ্যের মুখ চাহিয়া যখন আইন করিতে হইবে তখন কেবল স্থানীয় ন্যায়-অন্যায় বিচার করিলে চলিবে না এবং করিলে তাহা টিঁকিবেও না। ল্যাঙ্কাশিয়র স্বপ্ন নহে। ভারতবর্ষের দুঃখ যেমন সত্য, ল্যাঙ্কাশিয়রের লাভও তেমনি সত্য, বরঞ্চ শেষোক্তটার বল কিছু বেশি। আমি যেন ভারত-মন্ত্রিসভায় ল্যাঙ্কাশিয়রকে ছাড়িয়া দিয়াই একটা আইন পাস করিয়া দিলাম, কিন্তু ল্যাঙ্কাশিয়র আমাকে ছাড়িবে কেন। কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা– বিশেষত কম্‌লির গায়ে খুব জোর আছে।

চতুর্দিকের অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি একটা আইন পাস করিয়া শেষকালে আবার দায়ে পড়িয়া তাহা হইতে পশ্চাদ্‌বর্তী হইলেও মান থাকে না, এ দিকে আবার কৈফিয়তও তেমন সুবিধামতো নাই। নবাবের মতো বলিতে পারি না যে, আমার যে অভাব হইবে আমার যেমন ইচ্ছা তাহা পূরণ করিব; ও দিকে ন্যায়বুদ্ধিতে যাহা বলে তাহা সম্পন্ন করিবার অলজ্ঘ্য বিঘ্ন, অথচ এই সংকটের অবস্থাটাও সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়– ইহা বাস্তবিকই শোচনীয় বটে।

এইরূপ সময়টায় আমরা দেশী সভা এবং দেশী কাগজপত্রে যখন গোলমাল করিতে আরম্ভ করিয়া দিই তখন সাহেবেরা মাঝে মাঝে আমাদিগকে শাসায় এবং গবর্মেণ্ট্‌ যদি-বা আমাদের গায়ে হাত তুলিতে সংকোচ বোধ করে, ছোটো ছোটো কর্তারা কোনো সুযোগে একবার আমাদিগকে হাতে পাইলে ছাড়িতে চায় না এবং ভারতবর্ষীয় ইংরাজের বড়ো

বড়ো খবরের কাগজগুলা শৃঙ্খলবদ্ধ কুক্কুরের মতো দাঁত বাহির করিয়া আমাদের প্রতি অবিশ্রাম তারস্বর প্রয়োগ করিতে থাকে। ভালো, যেন আমরাই চুপ করিলাম, কিন্তু তোমাদের আপনাদিগকে থামাও দেখি। তোমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া ধর্মের পতাকা ধরিয়া দণ্ডায়মান হন তাঁহাদিগকে নির্বাসিত করো, তোমাদের জাতীয় প্রকৃতিতে যে ন্যায়পরতার আদর্শ আছে তাহাকে পরিহাস করিয়া ম্লান করিয়া দাও।

কিন্তু সে কিছুতেই হইবে না। তোমাদের রাজনীতির মধ্যে ধর্মবুদ্ধি একটা সত্য পদার্থ। কখনো-বা তাহার জয় হয়, কখনো-বা তাহার পরাজয় হয়; কিন্তু তাহাকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। আয়র্লণ্ড্‌ যখন ব্রিটানিয়ার নিকট কোনো অধিকার প্রার্থনা করে তখন সে যেমন এক দিকে খুনের ছুরিতে শান দিতে থাকে তেমনি অন্য দিকে ইংলণ্ডের ধর্মবুদ্ধিকে আপন দলে লইতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ যখন বিদেশী স্বামীর দ্বারে আপন দুঃখ নিবেদন করিতে সাহসী হয় তখন সেও ইংরাজের ধর্মবুদ্ধিকে আপন সহায় করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। মাঝে হইতে ইংরাজের রাজকার্যে ল্যাঠা বিস্তর বাড়িয়া যায়।

কিন্তু যতদিন ইংরাজ প্রকৃতির কোথাও এই সচেতন ধর্মবুদ্ধির প্রভাব থাকিবে, যতদিন তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজে সুকৃতি-দুষ্কৃতির একটি বিচারক বর্তমান থাকিবে, ততদিন আমাদের সভাসমিতি বাড়িয়া চলিবে, আমাদের সংবাদপত্র ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। ইহাতে আমাদের বলবান ইংরাজগণ বিফল গাত্রদাহে যতই অধীর হইয়া উঠিবে, আমাদের উৎসাহ এবং উদ্যমের আবশ্যকতা ততই আরো বাড়াইয়া তুলিবে মাত্র।

অপমানের প্রতিকার

একদা কোনো উচ্চপদস্থ বাঙালি গবর্মেণ্ট্‌-কর্মচারীর বাড়িতে কোনো কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তখন জুরি-দমন বিল লইয়া দেশে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

আহারান্তে নিমন্ত্রিত মহিলাগণ পার্শ্ববর্তী গৃহে উঠিয়া গেলে প্রসঙ্গক্রমে জুরিপ্রথার কথা উঠিল। ইংরাজ প্রোফেসর কহিলেন, যে দেশের লোক অর্ধসভ্য, অর্ধশিক্ষিত, যাহাদের ধর্মনীতির আদর্শ উন্নত নহে, জুরির অধিকার তাহাদের হস্তে কুফল প্রসব করে।

শুনিয়া এই কথা মনে করিলাম, ইংরাজ এত অধিক সভ্য হইয়াছে যে, আমাদের সহিত সভ্যতা রক্ষা সে বাহুল্য জ্ঞান করে। আমাদের নৈতিক আদর্শ কত মাত্রা উঠিয়াছে অথবা নামিয়াছে জানি না, কিন্তু ইহা জানি, যাঁহার আতিথ্য ভোগ করিতেছি তাঁহার স্বজাতিকে পরুষবাক্যে অবমাননা করা আমাদের শিষ্টনীতির আদর্শের অনেক বাহিরে।

অধ্যাপকমহাশয় আর-একটি কথা বলিয়াছিলেন, যে কথা কেবলমাত্র অমিষ্ট ও অশিষ্ট নহে, পরন্তু ইংরাজের মুখে অত্যন্ত অসংগত শুনিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, জীবনের পবিত্রতা, অর্থাৎ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা পরমদূষণীয়তা সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা ইংরাজের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্পপরিমিত। সেইজন্য হত্যাকারীর প্রতি ভারতবর্ষীয় জুরির মনে যথোচিত বিদ্বেষের উদ্রেক হয় না।

যাহারা মাংসাশী জাতি এবং যাহারা বিরাট হত্যাকাণ্ডের দ্বারা পৃথিবীর দুই নবাবিষ্কৃত মহাদেশের মধ্যে আপনাদের বাসযোগ্য স্থান পরিষ্কার করিয়া

লইয়াছে, এবং সম্প্রতি তরবারির দ্বারা তৃতীয় মহাদেশের প্রচ্ছন্ন বক্ষোদেশ অল্পে অল্পে বিদীর্ণ করিয়া তাহার শস্য-অংশটুকু সুখে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছে, তাহারা যদি নিমন্ত্রণ-সভায় আরামে ও স্পর্ধাভরে নৈতিক আদর্শের উচ্চ দণ্ডে চড়িয়া বসিয়া জীবনের পবিত্রতা ও প্রাণহিংসার অকর্তব্যতা সম্বন্ধে অহিংসক ভারতবর্ষকে উপদেশ দিতে থাকে তবে "অহিংসা পরমো ধর্মঃ' এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়াই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হয়।

এই ঘটনা আজ বছর-দুয়েকের কথা হইবে। সকলেই জানেন, তাহার পরে এই দুই বৎসরের মধ্যে ইংরাজ কর্তৃক অনেকগুলি ভারতবাসীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে এবং ইংরাজের আদালতে সেই-সকল হত্যাকাণ্ডে একজন ইংরাজেরও দোষ সপ্রমাণ হয় নাই। সংবাদপত্রে উপর্যুপরি এই-সকল সংবাদ পাঠ করা যায় এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি সেই মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু খড়্গনাসা ইংরাজ অধ্যাপকের তীব্র ঘৃণাবাক্য এবং জীবনহনন সম্বন্ধে তাঁহাদের নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান মনে পড়ে। মনে পড়িয়া তিলমাত্র সান্ত্বনা লাভ হয় না।

ভারতবর্ষীয়ের প্রাণ এবং ইংরাজের প্রাণ ফাঁসিকাষ্ঠের অটল তুলাদণ্ডে এক ওজনে তুলিত হইয়া থাকা ইহা বোধ হয় ইংরাজ মনে মনে রাজনৈতিক কুদৃষ্টান্তস্বরূপে গণ্য করে।

ইংরাজ এমন কথা মনে করিতে পারে, আমরা গুটিকতক প্রবাসী পঁচিশ কোটি বিদেশীকে শাসন করিতেছি। কিসের জোরে। কেবলমাত্র অস্ত্রের জোরে নহে, নামের জোরেও বটে। সেইজন্য সর্বদাই বিদেশীর মনে ধারণা জন্মাইয়া রাখা আবশ্যক– আমরা তোমাদের অপেক্ষা পঁচিশ কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা সমান ক্ষেত্রে আছি এরূপ ধারণার লেশমাত্র জন্মিতে দিলে আমাদের বলক্ষয়

হয়। পরস্পরের মধ্যে একটা সুদূর ব্যবধান, অধীন জাতির মনে একটা অনির্দিষ্ট সম্ভ্রম এবং অকারণ ভয় শতসহস্র সৈন্যের কাজ করে। ভারতবর্ষীয় যে কোনোদিন বিচারে নিজের প্রাণের পরিবর্তে ইংরাজকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখে নাই, ইহাতে তাহার মনে সেই সম্ভ্রম দৃঢ় হয়; মনে ধারণা হয়, আমার প্রাণে ইংরাজের প্রাণে অনেক তফাত, অসহ্য অপমান অথবা নিতান্ত আত্মরক্ষার স্থলেও ইংরাজের গায়ে হাত তুলিতে তাহার দ্বিধা হয়।

এই পলিসির কথা স্পষ্টত অথবা অস্পষ্টত ইংরাজের মনে আছে কি না জোর করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা অনেকটা নিশ্চয় অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্বজাতীয় প্রাণের পবিত্রতা তাঁহারা মনে মনে অত্যন্ত অধিক করিয়া উপলব্ধি করেন। একজন ইংরাজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিলে নিঃসন্দেহে তাঁহারা দুঃখিত হন। সেটাকে একটা “গ্রেট মিস্টেক’, এমন-কি, একটা “গ্রেট শেম’ মনে করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার শাস্তিস্বরূপে য়ুরোপীয়ের প্রাণ হরণ করা তাঁহারা সমুচিত মনে করিতে পারেন না। তদপেক্ষা লঘু শাস্তি যদি আইনে নির্দিষ্ট থাকিত তবে ভারতবর্ষীয়-হত্যাপরাধে ইংরাজের শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা অনেক অধিক হইত। যে জাতিকে নিজেদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচনা করা যায় সে জাতি সম্বন্ধে আইনের ধারায় অপক্ষপাতের বিধান থাকিলেও বিচারকের অন্তঃকরণে অপক্ষপাত রক্ষিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সে স্থলে প্রমাণের সামান্য ত্রুটি, সাক্ষ্যের সামান্য স্খলন এবং আইনের ভাষাগত তিলমাত্র ছিদ্রও স্বভাবতই এত বৃহৎ হইয়া উঠে যে, ইংরাজ অপরাধী অনায়াসে তাহার মধ্যে দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশের লোকের পর্যবেক্ষণশক্তি এবং ঘটনাস্মৃতি তেমন পরিষ্কার এবং প্রবল নহে; আমাদের স্বভাবের মধ্যে মানসিক শৈথিল্য এবং কল্পনার উচ্ছৃঙ্খলতা আছে এ দোষ স্বীকার করিতেই হয়। একটা ঘটনার

মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার সমস্ত আনুপূর্বিক পরম্পরা আমাদের মনে মুদ্রিত হইয়া যায় না- এইজন্য আমাদের বর্ণনার মধ্যে অসংগতি ও দ্বিধা থাকে, এবং ভয় অথবা তর্কের মুখে পরিচিত সত্য ঘটনারও সূত্র হারাইয়া ফেলি। এইজন্য আমাদের দেশীয় সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সূক্ষ্মরূপে নির্ধারণ করা বিদেশীয় বিচারকের পক্ষে সর্বদাই কঠিন। তাহার উপরে অভিযুক্ত যখন স্বদেশী তখন কঠিনতা শতসহস্রগুণে বাড়িয়া উঠে। আরও বিশেষত যখন স্বভাবতই ইংরাজের নিকটে স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসীর “প্রাণের পবিত্রতা’ স্বদেশীয়ের তুলনায় ক্ষুদ্রতমভগ্নাংশপরিমিত, তখন ভারতবর্ষের পক্ষে যথোপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব, একে আমাদের সাক্ষ্য দুর্বল, তাহাতে প্লীহা প্রভৃতি আমাদের শারীরযন্ত্রগুলিরও বিস্তর ত্রুটি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা সহজে মারাও পড়ি এবং তাহার বিচার পাওয়াও আমাদের দ্বারা দুঃসাধ্য হয়।

লজ্জা এবং দুঃখ- সহকারে এ-সমস্ত দুর্বলতা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু সেইসঙ্গে এ সত্যটুকুও প্রকাশ করিয়া বলা উচিত যে, উপর্যুপরি এই-সকল ঘটনায় দেশের লোকের চিত্ত নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ লোকে আইনের এবং প্রমাণের সূক্ষ্মবিচার করিতে পারে না। ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কোনো ইংরাজেরই প্রাণদণ্ড হয় না, এই তথ্যটি বারম্বার এবং অল্পকালের মধ্যে ঘন ঘন লক্ষ করিয়া তাহাদের মনে ইংরাজের অপক্ষপাত ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সুতীব্র সন্দেহের উদয় হয়।

সাধারণ লোকের মূঢ়তার কেন দোষ দিই। গবর্মেণ্ট্ অনুরূপ স্থলে কী করেন। যদি তাঁহারা দেখেন কোনো ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট অধিকাংশসংখ্যক আসামিকে খালাস দিতেছেন তখন তাঁহারা এমন বিবেচনা করেন না যে, সম্ভবত উক্ত ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট অন্য ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়পর, এবং তিনি সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় সূক্ষ্ম রূপে নির্ণয় না করিয়া

আসামিকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত, অতএব এই সচেতন ধর্মবুদ্ধি এবং সতর্ক ন্যায়পরতার জন্য সত্বর তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তব্য; অথবা যদি দেখিতে পান যে, কোনো পুলিস-কর্মচারীর এলাকায় অপরাধের সংখ্যার তুলনায় অল্পসংখ্যক অপরাধী ধরা পড়িতেছে অথবা চালান আসামি বহুলসংখ্যায় খালাস পাইতেছে তখন তাঁহারা এমন তর্ক করেন না যে, সম্ভবত এই পুলিস-কর্মচারী অন্য পুলিস-কর্মচারী অপেক্ষা সৎপ্রকৃতির– ইনি সাধু লোককে চোর বলিয়া চালান দেন না এবং মিথ্যা সাক্ষ্য স্বহস্তে সৃজন করিয়া অভিযোগের ছিদ্রসকল সংশোধন করিয়া লন না, অতএব পুরস্কারস্বরূপে অচিরাৎ ইঁহার গ্রেড বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তব্য। আমরা যে দুই আনুমানিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম উভয়তই সম্ভবপরতা ন্যায় ও ধর্মের দিকেই অধিক। কিন্তু কাহারও অবিদিত নাই, গবর্মেন্টের হস্তে উক্তবিধ হতভাগ্য সাধুদিগের সম্মান এবং উন্নতি লাভ হয় না।

জনসাধারণও গবর্মেন্টের অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মবুদ্ধি নহে, সেও খুব মোটামুটি রকমের বিচার করে। সে বলে, আমি অত আইনকানুন সাক্ষীসাবুদ বুঝি না, কিন্তু ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া একটা ইংরাজও উপযুক্ত দণ্ডার্হ হয় না এ কেমন কথা।

বারম্বার আঘাতে প্রজাসাধারণের হৃদয়ে যদি একটা সাংঘাতিক ক্ষত উৎপন্ন হইতে থাকে তবে তাহা গোপনে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা রাজভক্তি নহে। তাই “ব্যাবু’-অভিহিত অস্মৎপক্ষীয়েরা এ-সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলাই কর্তব্য জ্ঞান করে। আমরা ভারতরাজ্য-পরিচালক বাষ্পযন্ত্রের “বয়লার’স্থিত তাপমান মাত্র– আমাদের নিজের কোনো শক্তি নাই, ছোটো বড়ো বিচিত্র লৌহচক্র-চালনার কোনো ক্ষমতাই রাখি না, কেবল বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে আমাদের চঞ্চল পারদবিন্দু হঠাৎ উপরের দিকে চড়িয়া যায়। কিন্তু এঞ্জিনিয়ার-সাহেবের তাহাতে রাগ করা কর্তব্য নহে। তিনি

সূচিপত্র

একটি ঘুষি মারিলেই এই ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর পদার্থটি ভাঙিয়া তাহার সমস্ত পারদটুকু নাস্তিনভূত হইয়া যাইতে পারে- কিন্তু বয়লার-গত উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করা যন্ত্র-চালনকার্যের একটা প্রধান অঙ্গ। ইংরাজ অনেক সময় বিপরীত উগ্র মূর্তি ধারণ করিয়া বলে, প্রজাসাধারণের নাম করিয়া আত্মপরিচয় দিতেছ তোমরা কে। তোমরা তো আমাদেরই স্কুলের গুটিকয়েক বাক্যবিশারদ ইংরাজিনবিশ।

প্রভু, আমরা কেহই নহি। কিন্তু তোমাদের বিদ্রূপ বিরক্তি এবং ক্রোধদহনের দ্বারা অনুমান করিতেছি, তোমরা আমাদিগকে নিতান্তই সামান্য বলিয়া জ্ঞান কর না, এবং সামান্য জ্ঞান করা কর্তব্যও নহে। সংখ্যায় সামান্য হইলেও এই বিচ্ছিন্নসমাজ ভারতবর্ষে কেবল শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যেই শিক্ষা এবং হৃদয়ের ঐক্য আছে, এবং এই শিক্ষিতসম্প্রদায়ই ভারতবর্ষীয় হৃদয়বেদনা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ এবং নানা উপায়ে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে। এই শিক্ষিতসাধারণের অন্তরে কখন কিরূপ আঘাত-অভিঘাত লাগিতেছে তাহা মনোযোগসহকারে আলোচনা করা গবর্মেণ্টের রাজনীতির একটা প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। লক্ষণে যতদূর প্রকাশ পায়, গবর্মেণ্টেরও তাহাতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য নাই।

আমরা আলোচিত ব্যাপারে দুই কারণে আঘাত পাই। প্রথমত, একটা অত্যাচারের কথা শুনিলেই তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধানের প্রত্যাশা করিয়া হৃদয় ব্যগ্র হইয়া থাকে। যেজন্যই হউক, দোষী অব্যাহতি পাইলে অন্তর ক্ষুব্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, এই-সকল ঘটনায় আমরা আমাদের জাতীয় অসম্মান তীব্ররূপে অনুভব করিয়া একান্ত মর্মাহত হই।

দোষী অব্যাহতি পাওয়া দোষের বটে, কিন্তু আদালতের বিচারের নিকট অদৃষ্টবাদী ভারতবর্ষ অসম্ভব কিছু প্রত্যাশা করে না। আইন এতই জটিল,

সাক্ষ্য এতই পিচ্ছল, এবং দেশীয়- চরিত্র-জ্ঞান মমত্বহীন অবজ্ঞাকারী বিদেশীয়ের পক্ষে এতই দুর্লভ যে, অনিশ্চিতফল মকদ্দমা অনেকটা জুয়াখেলার মতো বোধ হয়। এইজন্যই জুয়াখেলার যেমন একটা মোহকারী উত্তেজনা আছে, আমাদের দেশের অনেক লোকের কাছে মকদ্দমার সেইরূপ একটা মাদকতা দেখা যায়। অতএব মকদ্দমার ফলের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে যখন সাধারণের একটা ধারণা আছে এবং যখন সে অনিশ্চয়তা-জন্য আমাদের স্বভাবদোষও অনেকটা দায়ী, তখন মধ্যে মধ্যে নির্দোষীর পীড়ন ও দোষীর নিষ্কৃতি শোচনীয় অথচ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া দেখিতে হয়।

কিন্তু বারম্বার য়ুরোপীয় অপরাধীর অব্যাহতি এবং তৎসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষীয়ের ঔদাসীন্যে ভারতবর্ষীয়ের প্রতি ইংরাজের আন্তরিক অবজ্ঞার পরিচয় দেয়। সেই অপমানের ধিক্কার শেলের ন্যায় স্থায়ীভাবে হৃদয়ে বিঁধিয়া থাকে।

যদি ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিত, যদি স্বল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি য়ুরোপীয় দেশীয় কর্তৃক হত হইত এবং প্রত্যেক অভিযুক্তই বিচারে মুক্তি পাইত, তবে এরূপ দুর্ঘটনার সমস্ত সম্ভাবনা লোপ করিবার সহস্রবিধ উপায় উদ্‌ভাবিত হইত। কিন্তু প্রাচ্য ভারতবাসী যখন নিরর্থক গুলি খাইয়া লাথি খাইয়া মরে তখন পাশ্চাত্য কর্তৃপুরুষদের কোনোপ্রকার দুর্ভাবনার লক্ষণ দেখা যায় না। কী করিলে এ-সমস্ত উপদ্রব নিবারণ হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন হইতেও শুনা যায় না।

কিন্তু আমাদিগের প্রতি কর্তৃজাতীয়ের এই-যে অবজ্ঞা, সেজন্য প্রধানত আমরাই ধিক্‌কারের যোগ্য। কারণ, এ কথা কিছুতেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না; সম্মান নিজের হস্তে।

আমরা সানুনাসিক স্বরে যে ভাবে ক্রমাগত নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে আমাদের আত্মমর্যাদার নিরতিশয় লাঘব হইতেছে।

উদাহরণস্থলে আমরা খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মুহুরিমারার ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক, ডিস্ট্রিক্ট্‌-ম্যাজিস্ট্রেট বেল-সাহেব অত্যন্ত দয়ালু উন্নতচেতা সহৃদয় ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য অথবা অবজ্ঞা নাই। আমাদের বিশ্বাস, তিনি যে মুহুরিকে মারিয়াছিলেন তাহাতে কেবল দুর্ধর্ষ ইংরাজপ্রকৃতির হঠকারিতা প্রকাশ পাইয়াছে, বাঙালি-ঘৃণা প্রকাশ পায় নাই। জঠরানল যখন প্রজ্বলিত তখন ক্রোধানল সামান্য কারণেই উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, তা বাঙালিরও হয় ইংরাজেরও হয়। অতএব এ ঘটনার প্রসঙ্গে বিজাতিবিদ্বেষের কথা উত্থাপন করা উচিত হয় না।

কিন্তু ফরিয়াদির পক্ষের বাঙালি ব্যারিস্টারমহাশয় এই মকদ্দমার প্রসঙ্গে বারম্বার বলিয়াছেন,মুহুরি-মারা কাজটা ইংরাজের অযোগ্য হইয়াছে, কারণ, বেল-সাহেবের জানা ছিল অথবা জানা উচিত ছিল যে, মুহুরি তাঁহাকে ফিরিয়া মারিতে পারে না।

এ কথা যদি সত্য হয় তবে যথার্থ লজ্জার বিষয় মুহুরির এবং মুহুরির স্বজাতিবর্গের। কারণ, হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্বলতা, কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্বলতা। এ কথা বলিতে পারি, মুহুরি যদি ফিরিয়া মারিত তবে বেল-সাহেব যথার্থ ইংরাজের ন্যায় তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন।

যথেষ্ট অপমানিত হইলেও একজন মুহুরি কোনো ইংরাজকে ফিরিয়া মারিতে পারে না, এই কথাটি ধ্রুবসত্যরূপে অম্লানমুখে স্বীকার করা এবং

ইহারই উপরে ইংরাজকে বেশি করিয়া দোষার্হ করা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অনাবশ্যক এবং লজ্জাজনক আচরণ।

মার খাওয়ার দরুন আইনমতে মুহুরির যে-কোনো প্রতিকার প্রাপ্য তাহা হইতে সে তিলমাত্র বঞ্চিত না হয় তৎপ্রতি আমদের দৃষ্টি রাখা উচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার আঘাত এবং অপমান-বেদনার উপর সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া অজস্র-পরিমাণে আহা-উহা করার এবং কেবলমাত্র বিদেশীকে গালিমন্দ দিবার কোনো কারণ দেখি না। বেল-সাহেবের ব্যবহার প্রশংসনীয় নহে, কিন্তু মুহুরি ও তাহার নিকটবর্তী সমস্ত লোকের আচরণ হেয়, এবং খুলনার বাঙালি ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণে হীনতা ও অন্যায় মিশ্রিত হইয়া সর্বাপেক্ষা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

অল্পকাল হইল ইহার অনুরূপ ঘটনা পাবনায় ঘটিয়াছিল। সেখানে ম্যুনিসিপ্যালিটির খেয়াঘাটের কোনো ব্রাহ্মণ কর্মচারী পুলিস-সাহেবের পাখা-টানা বেহারার নিকট উচিত মাশুল আদায় করাতে পুলিস-সাহেব তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া লাঞ্ছনার একশেষ করিয়াছিলেন, বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট সেই অপরাধী ইংরাজের কোনোরূপ দণ্ডবিধান না করিয়া কেবলমাত্র সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অথচ যখন পাখা-টানা বেহারা উক্ত ব্রাহ্মণের নামে উপদ্রবের নালিশ আনে তখন তিনি ব্রাহ্মণকে জরিমানা না করিয়া ছাড়েন নাই।

যে কারণ-বশত বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট প্রবল ইংরাজ অপরাধীকে সতর্ক এবং অক্ষম বাঙালি অভিযুক্তকে জরিমানা করিয়া থাকেন সেই কারণটি আমাদের জাতির মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমাদের স্বজাতিকে যে সম্মান আমরা নিজে দিতে জানি না, আমরা আশা করি এবং আবদার করি সেই সম্মান ইংরাজ আমদিগকে যাচিয়া সাধিয়া দিবে।

এক বাঙালি যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালি যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে, এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকারসাধন বাঙালির নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না এ কথা যখন বাঙালি বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরাজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজের স্বভাবের মধ্যে। গবর্মেণ্ট্ কোনো আইনের দ্বারা, বিচারের দ্বারা, তাহা দূর করিতে পারিবেন না।

আমরা অনেক সময় ইংরাজ কর্তৃক অপমান-বৃত্তান্ত শুনিলে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকি, কোনো ইংরাজের প্রতি ইংরাজ এমন ব্যবহার করিত না। করিত না বটে, কিন্তু ইংরাজের উপর রাগ করিতে বসার অপেক্ষা নিজের প্রতি রাগ করিতে বসিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। যে যে কারণ-বশত একজন ইংরাজ সহজে আর-একজন ইংরাজের গায়ে হাত তুলিতে সাহস করে না সেই কারণগুলি থাকিলে আমরাও অনুরূপ আচরণ প্রাপ্ত হইতে পারিতাম, সানুনাসিক স্বরে এত অধিক কান্নাকাটি করিতে হইত না।

বাঙালির প্রতি বাঙালি কিরূপ ব্যবহার করে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত। কারণ, তাহারই উপর আমাদের সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে। আমরা কি আমাদের ভৃত্যদিগকে প্রহার করি না, আমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি ঔদ্ধত্য এবং নিম্নশ্রেণীস্থদিগের প্রতি সর্বদা অসম্মান প্রকাশ করি না। আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চে নীচে বিভক্ত; যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে। নিম্নবর্তী কেহ তিলমাত্র স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিলে উপরের লোকের গায়ে তাহা অসহ্য বোধ হয়। ভদ্রলোকের নিকট “চাষা বেটা’ প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে। ক্ষমতাপন্নের নিকট অক্ষম লোক যদি সম্পূর্ণ অবনত হইয়া না থাকে তবে তাহাকে ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন দেখা যায় চৌকিদারের উপর কনস্টেবল, কনস্টেবলের উপর দারোগা, কেবল যে গবর্মেন্টের কাজ আদায়

করে তাহা নহে, কেবল যে উচ্চতর পদের উচিত সম্মানটুকু গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা নহে, তদতিরিক্ত দাসত্ব দাবি করিয়া থাকে– চৌকিদারের নিকট কনস্টেবল যথেচ্ছাচারী রাজা এবং কনস্টেবলের নিকট দারোগাও তদ্রূপ– তেমনি আমাদের সমাজে সর্বত্র অধস্তনের নিকট উচ্চতনের দাবির একেবারে সীমা নাই। স্তরে স্তরে প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে; তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতি মুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে। গুরুকে ভক্তি করিয়া ও প্রভুকে সেবা করিয়া ও মান্য লোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও মনুষ্যমাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্যাদা থাকা আবশ্যক তাহা রক্ষা করা যায়। আমাদের গুরু, আমাদের প্রভু, আমাদের রাজা, আমাদের মান্য ব্যক্তিগণ যদি সেই আত্মমর্যাদাটুকুও অপহরণ করিয়া লন তবে একেবারে মনুষ্যত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। সেই-সকল কারণে আমরা যথার্থই মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি, এবং সেই কারণেই ইংরাজ ইংরাজের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, আমাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না।

গৃহের এবং সমাজের শিক্ষায় যখন আমরা সেই মনুষ্যত্ব উপার্জন করিতে পারিব তখন ইংরাজ আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে এবং অপমান করিতে সাহস করিবে না। ইংরাজ-গবর্মেণ্টের নিকট আমরা অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম বিপর্যস্ত করা তাঁহাদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। হীনত্বের প্রতি আঘাত ও অবমাননা সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।

১৩০১

সুবিচারের অধিকার

সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন, অল্পকাল হইল সেতারা জিলায় বাই-নামক নগরে তেরো জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা অপরাধ করিয়া থাকিবেন, এবং আইনমতেও হয়তো তাঁহারা দণ্ডনীয়, কিন্তু ঘটনাটি সমস্ত হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে এবং আঘাতের ন্যায্য কারণও আছে।

উক্ত নগরের হিন্দুসংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অনেক অধিক এবং পরস্পরের মধ্যে কোনো কালে কোনো বিরোধের লক্ষণ দেখা যায় নাই। একটি মুসলমান সাক্ষীও প্রকাশ করিয়াছে যে, সে স্থানে হিন্দুর সহিত মুসলমানের কোনো বিবাদ নাই- বিবাদ হিন্দুর সহিত গবর্মেন্টের।

অকস্মাৎ ম্যাজিস্ট্রেট অশান্তি আশঙ্কা করিয়া কোনো-এক পূজা উপলক্ষে হিন্দুদিগকে বাদ্য বন্ধ করিতে আদেশ করেন। হিন্দুগণ ফাঁপরে পড়িয়া রাজাজ্ঞা ও দেবসম্মান উভয় রক্ষা করিতে গিয়া কোনোটাই রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা চিরনিয়মানুমোদিত বাদ্যাড়ম্বর বন্ধ করিয়া একটিমাত্র সামান্য বাদ্য-যোগে কোনোমতে উৎসব পালন করিলেন। ইহাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন কি না জানি না, মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলেন। নগরের তেরো জন ভদ্র হিন্দুকে জেলে চালান করিয়া দিলেন।

হাকিম খুব জবর্‌দস্ত, আইন খুব কঠিন, শাসন খুব কড়াক্কড়, কিন্তু এমন করিয়া স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয় কি না সন্দেহ। এমন করিয়া, যেখানে বিরোধ নাই সেখানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, যেখানে বিদ্বেষের বীজমাত্র আছে সেখানে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রবল প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া মহাসমারোহে অশান্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়।

সকলেই জানেন, অনেক অসভ্যদের মধ্যে আর কোনোপ্রকার চিকিৎসা নাই, কেবল ভূত-ঝাড়ানো আছে। তাহারা গর্জন করিয়া, নৃত্য করিয়া, রোগীকে মারিয়া ধরিয়া প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। ইংরাজ হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ ব্যাধির যদি সেইরূপ আদিম প্রণালী-মতে চিকিৎসা শুরু করেন তাহাতে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু ব্যাধির উপশম না হইবার সম্ভাবনা। এবং ওঝা ভূত ঝাড়িতে গিয়া যে ভূত নামাইয়া আনেন তাহাকে শান্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কন্‌গ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দুমুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।

অথচ লর্ড্ ল্যান্স্‌ডাউন হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড্ হ্যারিস পর্যন্ত সকলেই বলিতেছেন, এমন কথা যে মুখে আনে সে পাষণ্ড মিথ্যাবাদী। ইংরাজ-গবর্মেণ্ট্, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি যে অধিক পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন এ অপবাদকেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

আমরাও তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করি না। কন্‌গ্রেসের প্রতি গবর্মেন্টের সুগভীর প্রীতি না থাকিতে পারে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া কন্‌গ্রেসকে বলশালী না করুক এমন ইচ্ছাও তাঁহাদের থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, তথাপি রাজ্যের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অনৈক্যকে বিরোধে পরিণত করিয়া তোলা কোনো পরিণামদর্শী বিবেচক গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অনৈক্য থাকে সে ভালো, কিন্তু তাহা গবর্মেণ্টের সুশাসনে শান্তমূর্তি

ধারণ করিয়া থাকিবে। গবর্মেণ্টের বারুদখানায় বারুদ যেমন শীতল হইয়া আছে অথচ তাহার দাহিকাশক্তি নিবিয়া যায় নাই- হিন্দু-মুসলমানের আভ্যন্তরিক অসদ্‌ভাব গবর্মেণ্টের রাজনৈতিক শাস্ত্রশালায় সেইরূপ সুশীতলভাবে রক্ষিত হইবে, এমন অভিপ্রায় গবর্মেণ্টের মনে থাকা অসম্ভব নহে।

এই কারণে গবর্মেণ্ট্‌ হিন্দু-মুসলমানের গলাগলি-দৃশ্য দেখিবার জন্যও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন না, অথচ লাঠালাঠি-দৃশ্যটাও তাঁহাদের সুশাসনের হানিজনক বলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

সর্বদাই দেখিতে পাই, দুই পক্ষে যখন বিরোধ ঘটে এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হয় তখন ম্যাজিস্ট্রেট সূক্ষ্মবিচারের দিকে না গিয়া উভয় পক্ষকেই সমানভাবে দমন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কারণ, সাধারণ নিয়ম এই যে, এক হাতে তালি বাজে না। কিন্তু হিন্দুমুসলমান-বিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়াছে যে, দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরও অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনোকালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া এক পক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্য পক্ষের সাহস ও স্পর্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।

হিন্দুদের প্রতি গবর্মেণ্টের বিশেষ-একটা বিরাগ না থাকাই সম্ভব, কিন্তু একমাত্র গবর্মেণ্টের পলিসির দ্বারাই গবর্মেন্ট্‌ চলে না- প্রাকৃতিক নিয়ম একটা আছে। স্বর্গরাজ্যে পবনদেবের কোনোপ্রকার অসাধু অভিপ্রায় থাকিতে পারে না, তথাচ উত্তাপের নিয়মের বশবর্তী হইয়া তাঁহার মর্তরাজ্যের অনুচর

ঊনপঞ্চাশ বায়ু অনেক সময় অকস্মাৎ ঝড় বাধাইয়া বসে। আমরা গবর্মেণ্টের স্বর্গলোকের খবর ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, সে-সকল খবর লড্ ল্যান্স্‌ডাউন এবং লর্ড্ হ্যারিস জানেন; কিন্তু আমরা আমাদের চতুর্দিকের হাওয়ার মধ্যে একটা গোলযোগ অনুভব করিতেছি। স্বর্গধাম হইতে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ আসিতেছে, কিন্তু আমাদের নিকটবর্তী দেবচরগণের মধ্যে ভারি-একটা উষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমানেরাও জানিতেছেন, তাঁহাদের জন্য বিষ্ণুদূত অপেক্ষা করিয়া আছে; আমরাও হাড়ের মধ্যে কম্পসহকারে অনুভব করিতেছি, আমাদের জন্য যমদূত দ্বারের নিকটে গদাহস্তে বসিয়া আছে এবং উপরন্তু সেই যমদূতগুলার খোরাকি আমাদের নিজের গাঁঠ হইতে দিতে হইবে।

হাওয়ার গতিক আমরা যেরূপ অনুভব করিতেছি তাহা যে নিতান্ত অমূলক এ কথা বিশ্বাস হয় না। অল্পকাল হইল স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে গবর্মেণ্টের উচ্চ-উপাধিধারী কোনো শ্রদ্ধেয় ইংরাজ সিভিলিয়ান প্রকাশ করিয়াছেন যে, আজকাল সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের মনে একটা হিন্দুবিদ্বেষের ভাব ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমানজাতির প্রতিও একটি আকস্মিক বাৎসল্যরসের উদ্রেক দেখা যাইতেছে। মুসলমান-ভ্রাতাদের প্রতি ইংরাজের স্তনে যদি ক্ষীরসঞ্চার হইয়া থাকে তবে তাহা আনন্দের বিষয়, কিন্তু আমাদের প্রতি যদি কেবলই পিত্তসঞ্চার হইতে থাকে তবে সে আনন্দ অকপটভাবে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

কেবল রাগদ্বেষের দ্বারা পক্ষপাত এবং অবিচার ঘটিতে পারে তাহা নহে, ভয়েতে করিয়াও ন্যায়পরতার নিক্তির কাঁটা অনেকটা পরিমাণে কম্পিত বিচলিত হইয়া উঠে। আমাদের এমন সন্দেহ হয় যে, ইংরাজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এইজন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁষিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।

ইহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে “ঝিকে মারিয়া বউকে শেখানো’ রাজনীতি। ঝিকে কিছু অন্যায় করিয়া মারিলেও সে সহ্য করে; কিন্তু বউ পরের ঘরের মেয়ে, উচিত শাসন উপলক্ষে গায়ে হাত তুলিতে গেলেও বরদাস্ত না করিতেও পারে। অথচ বিচারকার্যটা একেবারে বন্ধ করাও যায় না। যেখানে বাধা স্বল্পতম সেখানে শক্তিপ্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, এ কথা বিজ্ঞানসম্মত। অতএব হিন্দু- মুসলমানের দ্বন্দ্বে শান্তপ্রকৃতি, ঐক্যবন্ধনহীন, আইন ও বেআইন -সহিষ্ণু হিন্দুকে দমন করিয়া দিলে মীমাংসাটা সহজে হয়। আমরা বলি না যে, গবর্মেণ্টের এইরূপ পলিসি; কিন্তু কার্যবিধি স্বভাবত, এমন-কি, অজ্ঞানত, এই পথ অবলম্বন করিতে পারে- যেমন নদীস্রোত কঠিন মৃত্তিকাকে পাশ কাটাইয়া স্বতই কোমল মৃত্তিকাকে খনন করিয়া চলিয়া যায়।

অতএব, হাজার গবর্মেণ্টের দোহাই পাড়িতে থাকিলেও গবর্মেণ্ট্ যে ইহার প্রতিকার করিতে পারেন, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছি, বিলাতে আন্দোলন করিতেছি, অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিতেছি, ভারতবর্ষের উচ্চ হইতে নিম্নতন ইংরাজ কর্মচারীদের কার্য স্বাধীনভাবে সমালোচনা করিতেছি, অনেক সময় তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিতে কৃতকার্য হইতেছি এবং ইংলণ্ড্‌বাসী অপক্ষপাতী ইংরাজের সহায়তা লইয়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক রাজবিধি সংশোধন করিতেও সক্ষম হইয়াছি। এই-সকল ব্যবহারে ইংরাজ এতদূর পর্যন্ত জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে যে, ভারত-রাজতন্ত্রের বড়ো বড়ো ভূধরশিখর হইতেও রাজনীতিসম্মত মৌন ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে আগ্নেয় স্রাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অপর পক্ষে, মুসলমানগণ রাজভক্তিভরে অবনতপ্রায় হইয়া কন্‌গ্রেসের উদ্দেশ্যপথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই-সকল কারণে ইংরাজের মনে একটা বিকার উপস্থিত হইয়াছে- গবর্মেণ্টের ইহাতে কোনো হাত নাই।

কেবল ইহাই নহে। কন্‌গ্রেস অপেক্ষা গো-রক্ষণী সভাটাতে ইংরাজের মনে অধিক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন, ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে যে হিন্দুজাতি আত্মরক্ষার জন্য কখনো একত্র হইতে পারে নাই, চাই-কি গো-রক্ষার জন্য সে জাতি একত্র হইতেও পারে। অতএব, সেই সূত্রে যখন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আরম্ভ হইল তখন স্বভাবতই মুসলমানের প্রতি ইংরাজের দরদ বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন্ পক্ষ অধিক অপরাধী, অথবা উভয় পক্ষ ন্যূনাধিক অপরাধী কি না, তাহা অবিচলিতচিত্তে অপক্ষপাতসহকারে বিচার করিবার ক্ষমতা অতি অল্প ইংরাজের ছিল। তখন তাঁহারা ভীতচিত্তে একটা রাজনৈতিক সংকট কিরূপে নিবারণ হইতে পারে সেই দিকেই অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। তৃতীয়-খণ্ড সাধনায় “ইংরাজের আতঙ্ক’-নামক প্রবন্ধে আমরা সাঁওতাল-দমনের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি, ভয় পাইলে সুবিচার করিবার ধৈর্য থাকে না এবং যাহারা জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত ভীতির কারণ তাহাদের প্রতি একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ভাবের উদয় হয়। এই কারণে, গর্বমেণ্ট্-নামক যন্ত্রটি যেমনি নিরপেক্ষ থাক্, গবর্মেণ্টের ছোটোবড়ো যন্ত্রীগুলি যে আদ্যোপান্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বারম্বার অস্বীকার করিলেও লক্ষণে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছিল, এখনো প্রকাশ পাইতেছে। এবং সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের মনে বিবিধ স্বাভাবিক কারণে একবার এইরূপ বিকার উপস্থিত হইলে তাহার যে ফল সে ফলিতে থাকিবেই– ক্যান্যুট যেমন সমুদ্রতরঙ্গকে নিয়মিত করিতে পারেন নাই, গবর্মেণ্ট্ও সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মকে বাধা দিতে পারিবেন না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কেনই-বা বৃথা আন্দোলন করা, এবং আমারই-বা এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিবার প্রয়োজন কী ছিল।

গবর্মেণ্টের নিকট সকরুণ অথবা সাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখার কোনো আবশ্যক নাই, সে কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ক্যান্যুট সমুদ্রতরঙ্গকে যেখানে থামিতে বলিয়াছিলেন সমুদ্রতরঙ্গ সেখানে থামে নাই, সে জড়শক্তির নিয়মানুবর্তী হইয়া যথোপযুক্ত স্থানে গিয়া আঘাত করিয়াছিল। ক্যান্যুট মুখের কথায় বা মন্ত্রোচ্চারণে তাহাকে ফিরাইতে পারিতেন না বটে, কিন্তু বাঁধ বাঁধিয়া তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিতেন।

স্বাভাবিক নিয়মানুগত আঘাতপরম্পরাকে যদি অর্ধপথে বাধা দিতে হয় তবে আমাদিগকে বাঁধ বাঁধিতে হইবে। সকলকে এক হইতে হইবে, সকলকে সমহৃদয় হইয়া সমবেদনা অনুভব করিতে হইবে।

দল বাঁধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে- আমাদের সে শক্তিও নাই। কিন্তু দল বাঁধিলে যে একটা বৃহত্ত্ব এবং বল লাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সুবিচার আকর্ষণ করা বড়ো কঠিন।

কিন্তু বালির বাঁধ বাঁধিবে কী করিয়া। যাহারা বারম্বার নিহত পরাহত হইয়াছে, অথচ কোনোকালে সংহত হইতে শিখে নাই, যাহাদের সমাজের মধ্যে অনৈক্যের সহস্র বিষবীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে কিসে বাঁধিতে পারিবে। ইংরাজ যে আমাদের মর্মবেদনা অনুভব করিতে পারে না এবং ইংরাজ ঔষধের দ্বারা চিকিৎসার চেষ্টা না করিয়া কঠিন আঘাতের দ্বারা আমাদের হৃদয়ব্যথা চতুর্গুণ বর্ধিত করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, এই বিশ্বাসে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে সমস্ত হিন্দুজাতির হৃদয়

অলক্ষিতভাবে প্রতিদিন পরস্পর নিকটে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। আমাদের স্বজাতি এখনো আমাদের স্বজাতীয়ের পক্ষে ধ্রুব আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিতে পারেন নাই। এইজন্য বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠা-স্থানকে অধিক আশঙ্কা করি। খরবেগ নদীর মধ্যস্রোত অপেক্ষা তাহার শিথিলবন্ধন ভঙ্গপ্রবণ তটভূমিকে পরিহার করিয়া চলিতে হয়।

আমরা জানি, বহুকাল পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে। আমরা জানি যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে। যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ; আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না– কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে। কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ত্ব এবং স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তা -বশত আমাদের মধ্যে দুই-চারিজন লোকও যখন শেষ পর্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।

জানি না হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অথবা ভারতবর্ষীয় ও ইংরাজের সংঘর্ষস্থলে আমরা যাহা অনুমান ও অনুভব করিয়া থাকি তাহা সত্য কি না, আমরা যে অবিচারের আশঙ্কা করিয়া থাকি তাহা সমূলক কি না; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে, কেবলমাত্র বিচারকের অনুগ্রহ ও কর্তব্যবুদ্ধির উপর বিচারভার রাখিয়া দিলে সুবিচারের অধিকারী হওয়া যায় না। রাজতন্ত্র যতই উন্নত হউক, প্রজার অবস্থা নিতান্ত অবনত হইলে সে কখনোই আপনাকে উচ্চে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। কারণ, মানুষের দ্বারাই রাজ্য চলিয়া

থাকে, যন্ত্রের দ্বারাও নহে, দেবতার দ্বারাও নহে। তাহাদের নিকট যখন আমরা আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া প্রমাণ দিব তখন তাহারা সকল সময়েই আমাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। যখন ভারতবর্ষে অন্তত কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরাজ অন্তরের সহিত অনুভব করিবে যে, ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্টভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহারা কখনো ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।

১৩০১

কণ্ঠরোধ

(সিডিশন-বিল পাস হইবার পূর্বদিনে টাউনহলে পঠিত)

অদ্য আমি যে ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা যদিও বাঙালির ভাষা, দুর্বলের ভাষা, বিজিত জাতির ভাষা, তথাপি সে ভাষাকে আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভয় করিয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, এ ভাষা তাঁহারা জানেন না। এবং যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার সেইখানেই অন্ধ আশঙ্কার প্রেতভূমি।

কারণ যাহাই হউক-না কেন, যে ভাষা আমাদের শাসনকর্তারা জানেন না এবং যে ভাষাকে তাঁহারা মনে মনে ভয় করেন সে ভাষায় তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আমি ততোধিক ভয় করি। কেননা, আমরা কোন্ ভাব হইতে কী কথা বলিতেছি, আমাদের কথাগুলি সুদুঃসহ বেদনা হইতে উচ্ছ্বসিত না দুর্বিষহ স্পর্ধা হইতে উদ্‌গীরিত, তাহার বিচারের ভার তাঁহাদেরই হস্তে, এবং তাহার বিচারের ফল নিতান্ত সামান্য নহে।

আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নির্বোধও নহি। উদ্যত রাজদণ্ডপাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাতমৃত্যুর ইচ্ছাও আমার নাই। কিন্তু আমাদের রাজকীয় দণ্ডধারী পুরুষটি ভাষার ঠিক কোন্ সীমানায় ঘাটি বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা আমি স্পষ্টরূপে জানি না, এবং আমি ঠিক কোন্‌খানে পদার্পণ করিলে শাসনকর্তার লগুড় আসিয়া আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহা কর্তার নিকটও অস্পষ্ট; কারণ, কর্তার নিকট আমার ভাষা অস্পষ্ট, আমিও নিরতিশয় অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার শাসনদণ্ড আনুমানিক আশঙ্কা-বেগে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া দণ্ডবিধির ন্যায়সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক আকস্মিক উল্কাপাতের ন্যায় অযথাস্থানে দুর্বল জীবের

অন্তরিন্দ্রিয়কে অসময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে। এমন স্থলে সর্বতোভাবে মূক হইয়া থাকাই সুবুদ্ধির কাজ, এবং আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে অনেকেই কর্তব্যক্ষেত্র হইতে যথেষ্ট দূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেই নিরাপদ সদ্‌বুদ্ধি অবলম্বন করিবেন তাহারও দুই-একটা লক্ষণ এখন হইতে দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশের বিক্রমশালী বাগ্মী, যাঁহারা বিলাতি সিংহনাদে শ্বেতদ্বৈপায়নগণের চিত্তেও সহসা বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারেন, তাঁহাদের অনেক বিবর আশ্রয় করিয়া বাগ্‌রোধ অভ্যাস করিতে বসিবেন– দেশের এমন একটা দুঃসময় আসন্ন। সে সময়ে দুর্ভাগ্য দেশের নির্বাক্‌ বেদনা নিবেদন করিতে রাজদ্বারে অগ্রসর হইবে এমন দুঃসাহসিক দেশবন্ধু দুর্লভ হইয়া পড়িবে। যদিচ শাস্ত্রে আছে “রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব’, তথাপি শ্মশান যখন রাজদ্বারের এত অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছে তখন ভীত বন্ধুদিগকে কথঞ্চিৎ মার্জনা করিতে হইবে।

অবশ্য, রাজা বিমুখ হইলে আমরা ভয় পাইব না আমাদের এমন স্বভাবই নহে, কিন্তু রাজা যে কেন আমাদের প্রতি এতটা ভয় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই প্রশ্নই আমাদিগকে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

যদিচ ইংরাজ আমাদের একেশ্বর রাজা এবং তাঁহাদের শক্তিও অপরিমেয়, তথাপি এ দেশে তাঁহারা ভয়ে ভয়ে বাস করেন– ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্ময় বোধ করি। অতিদূরে রুশিয়ার পদধ্বনি অনুমানমাত্র করিলে তাঁহারা যে কিরূপ চকিত হইয়া উঠেন তাহা আমরা বেদনার সহিত অনুভব করিয়াছি। কারণ, প্রত্যেকবার তাঁহাদের সেই হৃৎকম্পের চমকে আমাদের ভারতলক্ষ্মীর শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আমাদের দৈন্যপীড়িত কঙ্কালসার দেশের ক্ষুধার অন্নপিণ্ডগুলি মুহূর্তের মধ্যে কামানের কঠিন লৌহপিণ্ডে পরিণত হইয়া যায়– সেটা আমাদের পক্ষে লঘুপাক খাদ্য নহে।

বাহিরে প্রবল শত্রু সম্বন্ধে এইরূপ সচকিত সতর্কতার সমূলক কারণ থাকিতেও পারে, তাহার নিগূঢ় সংবাদ এবং জটিল তত্ত্ব আমাদের জানা নাই।

কিন্তু আমরা আমাদিগকে জানি। আমরা যে কোনো অংশেই ভয়ংকর নহি সে বিশ্বাস আমাদের বদ্ধমূল। এবং যতক্ষণ সে বিশ্বাস আমাদের নিজের মনে নিঃসংশয়ভাবে দৃঢ় থাকে ততক্ষণ আমাদের ভয়ংকারিতাও সর্বতোভাবে দূরীকৃত।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে উপর্যুপরি কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনায় আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছি যে, বিনা চেষ্টায়, বিনা কারণে আমরা ভয় উৎপাদন করিতেছি। আমরা ভয়ঙ্কর! আশ্চর্য! ইহা আমরা পূর্বে কেহ সন্দেহই করি নাই।

ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম, গবর্মেণ্ট্ অত্যন্ত সচকিতভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ-প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না– আমরা অত্যন্ত ভয়ংকর!

একদিন শুনিলাম, অপরাধিবিশেষকে সন্ধানপূর্বক গ্রেফ্‌তার করিতে অক্ষম হইয়া রোষরক্ত গবর্মেণ্ট্ সাক্ষীসাবুদ-বিচারবিবেচনার বিলম্বমাত্র না করিয়া একেবারে সমস্ত পুনা-শহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন। আমরা ভাবিলাম, পুনা বড়ো ভয়ংকর শহর! ভিতরে ভিতরে না জানি কী ভয়ানক কাণ্ডই করিয়াছে!

আজ পর্যন্ত সে ভয়ানক কাণ্ডের কোনো অন্ধিসন্ধি পাওয়া গেল না।

কাণ্ডটা সত্য অথবা স্বপ্ন ইহাই ভাবিয়া অবাক হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় তারের খবর আসিল, রাজপ্রাসাদের গুপ্তচূড়া হইতে কোন্‌-এক অজ্ঞাত অপরিচিত বীভৎস আইন বিদ্যুতের মতো পড়িয়া নাটুভ্রাতৃযুগলকে ছোঁ মারিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আকস্মিক গুরুবর্ষার মতো সমস্ত বোম্বাই-প্রদেশের মাথার উপর কালো মেঘ নিবিড় হইয়া উঠিল এবং জবর্‌দস্ত শাসনের ঘন ঘন বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির আয়োজন-আড়ম্বরে আমরা ভাবিলাম– ভিতরে কী ঘটিয়াছে জানি না, কিন্তু বেশ দেখিতেছি ব্যাপারটি সহজ নহে; মারাহাট্টারা বড়ো ভয়ংকর জাত!

এক দিকে পুরাতন আইন-শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল, আবার অন্য দিকে রাজ-কারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল-নির্মাণের ভীষণ হাতুড়িধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। একটা ভয়ানক ধুম পড়িয়া গেছে। আমরা এতই ভয়ংকর!

আমরা এতকাল বিপুলা পৃথিবীকে অচলা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, এবং এই প্রবলা বসুন্ধরার প্রতি আমরা যতই নির্ভর ও যতই উপদ্রব করিয়াছি তিনি তাহা অকুণ্ঠিত প্রকাণ্ড শক্তিতে অনায়াসে বহন করিয়াছেন। একদিন নববর্ষার দুর্যোগে মেঘাবৃত অপরাহ্ণে অকস্মাৎ আমাদের সেই চিরনির্ভর ভূমি জানি না কোন্‌ নিগূঢ় আশঙ্কায় কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম, তাঁহার সেই মুহূর্তকালের চাঞ্চল্যে আমাদের বহুকালের প্রিয় পুরাতন বাসস্থানগুলি ধূলিসাৎ হইল।

গবর্মেন্টের অচলা নীতিও যদি অকস্মাৎ সামান্য অথবা অনির্দেশ্য আতঙ্কে বিচলিত ও বিদীর্ণ হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে তাহার শক্তি ও নীতির দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমাদের চিরবিশ্বাস হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়। সেই আঘাতে প্রজার মনে ভয়সঞ্চার হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু

সেইসঙ্গে নিজের প্রতিও তাহার অকস্মাৎ অত্যধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। হঠাৎ এ প্রশ্নটা আপনিই মনে উদয় হয়- আমি না জানি কী!

সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদের একটুখানি সান্ত্বনা আছে। কারণ, সম্পূর্ণ নিস্তেজ নিঃসত্ত্ব জাতির প্রতি বলপ্রয়োগ করা যেমন অনাবশ্যক তেমনি তাহাকে শ্রদ্ধা করাও অসম্ভব। আমাদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত আয়োজন দেখিলে ন্যায়-অন্যায় বিচার-অবিচারের তর্ক দূরে রাখিয়া এ কথা আমাদের স্বভাবতই মনে হয় যে, হয়তো আমাদের মধ্যে একটা শক্তির সম্ভাবনা আছে যাহা কেবল মূঢ়তাবশত আমরা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না। গবর্মেণ্ট্ যখন চারি তরফ হইতেই কামান পাতিতেছেন তখন ইহা নিশ্চয় যে,আমরা মশা নহি, অন্তত মরা মশা নহি।

আমাদের স্বজাতির অন্তরে একটা প্রাণ একটা শক্তির সঞ্চার-সম্ভাবনা আমাদের পক্ষে পরমানন্দের বিষয় এ কথা অস্বীকার করা এমন সুস্পষ্ট কপটতা যে, তাহা পলিসিস্বরূপে অনাবশ্যক এবং প্রবঞ্চনাস্বরূপে নিষ্ফল। অতএব গবর্মেণ্টের তরফ হইতে আমাদের কোনোখানে সেই শক্তির স্বীকার দেখিতে পাইলে নিরাশ চিত্তে কিঞ্চিৎ গর্বের সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু হায়, এ গর্ব আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক, শুক্তির মুক্তার ন্যায় ইহা আমাদের পক্ষে ব্যাধি; উপযুক্ত ধীবররাজ আমাদের জঠরের মধ্যে কঠোর ছুরিকা চালাইয়া এই গর্বটুকু নিঃশেষে বাহির করিয়া লইয়া নিজেদের রাজমুকুটের উপরে স্থাপন করিবেন। ইংরাজ নিজের আদর্শে পরিমাপ করিয়া আমাদিগকে যে অযথা সম্মান দিতেছেন সে সম্মান হয়তো আমাদের পক্ষে একই কালে পরিহাস এবং মৃত্যু। আমাদের যে বল সন্দেহ করিয়া গবর্মেণ্ট্ আমাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেছেন সে বল যদি আমাদের না থাকে তবে

গবর্মেন্টের গুরুদণ্ডে আমরা নষ্ট হইয়া যাইব, সে বল যদি যথার্থ থাকে তবে দণ্ডের তাড়নায় তাহা উত্তরোত্তর দৃঢ় এবং গোপনে প্রবল হইবে।

আমরা তো আমাদিগকে জানি, কিন্তু ইংরাজ আমাদিগকে জানেন না। না জানিবার ১০১ কারণ আছে, তাহা বিস্তারিত পর্যালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। মূল কথাটা এই, তাঁহারা আমাদিগকে জানেন না। আমরা পূর্বদেশী, তাঁহারা পশ্চিমদেশী। আমাদের মধ্যে যে কী হইতে কী হয়, কোথায় আঘাত লাগিলে কোন্‌খানে ধোঁয়াইয়া উঠে, তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন না। সেইজন্যই তাঁহাদের ভয়। আমাদের মধ্যে ভয়ংকরত্বের আর কোনো লক্ষণ নাই; কেবল একটি আছে- আমরা অজ্ঞাত। আমরা স্তন্যপায়ী উদ্ভিজ্জাশী জীব, আমরা শান্ত সহিষ্ণু উদাসীন। কিন্তু তবু আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই, কারণ আমরা প্রাচ্য, আমরা দুর্জ্ঞেয়।

সত্য যদি তাহাই হইবে তবে, হে রাজন্‌, আমাদিগকে আরো কেন অজ্ঞেয় করিয়া তুলিতেছ। যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরো পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন। যে একমাত্র উপায়ে আমরা আত্মপ্রকাশ করিতে পারি, তোমাদের নিকট আপনাকে পরিচিত করিতে পারি, তাহা রোধ করিয়া ফল কী।

সিপাহিবিদ্রোহের পূর্বে হাতে হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না- সেই নির্বাক্‌ নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ংকর নহে। সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ, সেইজন্যই কি তাহা নিদারুণ নহে। সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম-অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না। যদি কখনো কখনো ঘনান্ধকার অমাবস্যারাত্রে আমাদের অবলা ভারতভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবাভিসারে যাত্রা করে তবে সিংহদ্বারের কুক্কুর

না ডাকিতেও পারে, রাজার প্রহরী না জাগিতেও পারে, পুররক্ষক কোতোয়াল তাহাকে না চিনিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গের কঙ্কণকিঙ্কিণীনূপুরকেরয়ূর, তাহার বিচিত্র ভাষার বিচিত্র সংবাদপত্রগুলি কিছু-না-কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না। প্রহরী যদি নিজহস্তে সেই মুখর ভূষণগুলির ধ্বনি রোধ করিয়া দেন তবে তাঁহার নিদ্রার সুযোগ হইতে পারে, কিন্তু পাহারার কী সুবিধা হইবে জানি না।

কিন্তু পাহারা দিবার ভার যে জাগ্রত লোকটির হাতে পাহারা দিবার প্রণালীও তিনি স্থির করিবেন; সে সম্বন্ধে বিজ্ঞভাবে পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে নিরতিশয় ধৃষ্টতা এবং সম্ভবত তাহা নিরাপদও নহে। অতএব মাতৃভাষায় আমার এই দুর্বল উদ্যমের মধ্যে সে দুশ্চেষ্টা নাই। তবে আমার এই ক্ষীণ ক্ষুদ্র ব্যর্থ অথচ বিপৎসংকুল বাচালতা কেন। সে কেবল প্রবলের ভয় দুর্বলের পক্ষে কী ভয়ংকর তাহা স্মরণ করিয়া।

ইহার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছুদিন হইল একদল ইতরশ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্রখণ্ডহস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপদ্রবের লক্ষটা বিশেষরূপে ইংরাজেরই প্রতি। তাহাদের শাস্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, ইঁটটি মারিলেই পাটকেলটি খাইতে হয়; কিন্তু মূঢ়গণ ইঁটটি মারিয়া পাটকেলের অপেক্ষা অনেক শক্ত শক্ত জিনিস খাইয়াছিল। অপরাধ করিল, দণ্ড পাইল; কিন্তু ব্যাপারটা, কী আজ পর্যন্ত স্পষ্ট বুঝা গেল না। এই নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ সংবাদপত্র পড়েও না, সংবাদপত্রে লেখেও না। একটা ছোটোবড়ো কাণ্ড হইয়া গেল, অথচ এই মূক নির্বাক্ প্রজাসম্প্রদায়ের মনের কথা কিছুই বোঝা গেল না। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই সাধারণের নিকট তাহার একটা অযথা এবং কৃত্রিম গৌরব জন্মিল। কৌতূহলী কল্পনা হ্যারিসন রোডের প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের অর্ধচন্দ্রশিখরী

রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সম্ভব ও অসম্ভব অনুমানকে শাখাপল্লবায়িত করিয়া চলিল। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই আতঙ্কচকিত ইংরাজি কাগজ কেহ বলিল, ইহা কন্‌গ্রেসের সহিত যোগবদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা; কেহ বলিল, মুসলমানদের বস্তিগুলা একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া যাক; কেহ বলিল, এমন নিদারুণ বিপৎপাতের সময় তুহিনাবৃত শৈলশিখরের উপর বড়োলাট-সাহেবের এতটা সুশীতল হইয়া বসিয়া থাকা উচিত হয় না।

রহস্যই অনিশ্চিত ভয়ের প্রধান আশ্রয়স্থান, এবং প্রবল ব্যক্তির অনিশ্চিত ভয় দুর্বল ব্যক্তির নিশ্চিত মৃত্যু। রুদ্ধবাক সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়োই ভয়ংকর অবস্থা। তাহাতে করিয়া আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রাজপুরুষদের চক্ষে সংশয়ান্ধকারে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখাইবে। দুরপনেয় অবিশ্বাসে রাজদণ্ড উত্তরোত্তর খরধার হইয়া উঠিবে এবং প্রজার হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত ও নির্বাক নৈরাশ্যে বিষতিক্ত হইতে থাকিবে। আমরা ইংরাজের একান্ত অধীন প্রজা, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম তাঁহার দাসত্ব করে না। আঘাত করিলে আমরা বেদনা পাইব; ইংরাজ হাজার চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেও এ নিয়মটাকে দেশান্তরিত করিতে পারিবেন না। তাঁহারা রাগ করিয়া আঘাতের মাত্রা বাড়াইতে পারেন, কিন্তু বেদনার মাত্রাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিবে। কারণ, সে বিধির নিয়ম; পিনাল-কোডে তাহার কোনো নিষেধ নাই। অন্তর্দাহ বাক্যে প্রকাশ না হইলে অন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থায় রাজাপ্রজার সম্বন্ধ যে কিরূপ বিকৃত হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইতেছি।

কিন্তু এই অনির্দিষ্ট সংশয়ের অবস্থা সর্বাপেক্ষা প্রধান অমঙ্গল নহে। আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অশুভ আছে।

সূচিপত্র

মানবচরিত্রের উপরে পরাধীনতার অবনতিকর ফল আছেই, তাহা আমরা ইংরাজের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। অসত্যাচরণ কপটতা অধীন জাতির আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ হইয়া তাহার আত্মসম্মানকে, তাহার মুনষ্যত্বকে নিশ্চিতরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বাধীনতাপূজক ইংরাজ আপন প্রজাদিগের অধীন দশা হইতে সেই হীনতার কলঙ্ক যথাসম্ভব অপনয়ন করিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা বিজিত তাঁহারা বিজেতা, আমরা দুর্বল তাঁহারা সবল, ইহা তাঁহারা পদে পদে স্মরণ করাইয়া রাখেন নাই। এতদূর পর্যন্তও ভুলিতে দিয়াছিলেন যে আমরা মনে করিয়াছিলাম, ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক অধিকার।

আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি, দুর্বলের কোনো অধিকারই নাই। আমরা যাহা মনুষ্যমাত্রেরই প্রাপ্য মনে করিয়াছিলাম তাহা দুর্বলের প্রতি প্রবলের স্বেচ্ছাধীন অনুগ্রহ মাত্র। আমি আজ যে এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া একটিমাত্র শব্দোচ্চারণ করিতেছি তাহাতে আমার মনুষ্যোচিত গর্বানুভব করিবার কোনো কারণ নাই। দোষ করিবার ও বিচার হইবার পূর্বেই যে আমি কারাগারের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি না তাহাতেও আমার কোনো গৌরব নাই।

ইহা এক হিসাবে সত্য। কিন্তু এই সত্য সর্বদা অনুভব করা রাজা প্রজা কাহারো পক্ষে হিতকর নহে। মনুষ্য অবস্থার পার্থক্যের মাঝখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, অসমানতার মধ্যেও নিজের মনুষ্যত্ব রক্ষার চেষ্টা করে।

শাসিত ও শাসনকর্তার মধ্যবর্তী শাসনশৃঙ্খলাটাতে সর্বদা ঝংকার না দিয়া, সেটাকে আত্মীয়সম্বন্ধবন্ধনরূপে ঢাকিয়া রাখিলে অধীন জাতির ভার লাঘব হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এই প্রকারের একটা আচ্ছাদনপট। ইহাতে আমাদের অবস্থার হীনতা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা জেতৃজাতির সহস্র ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও এই স্বাধীনতাসূত্রে অন্তরঙ্গভাবে তাঁহাদের নিকটবর্তী ছিলাম। আমরা দুর্বল হীন ভয় ও কপটতা ভুলিয়া মুক্তহৃদয়ে উন্নতমস্তকে সত্য কথা স্পষ্ট কথা বলিতে শিখিতেছিলাম।

যদিচ উচ্চতর রাজকার্যে আমাদের স্বাধীনতা ছিল না তথাপি নির্ভীকভাবে পরামর্শ দিয়া, স্পষ্টবাক্যে সমালোচনা করিয়া, আপনাদিগকে এই বিপুল ভারতরাজ্যশাসনকার্যের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতাম। তাহার অন্য ফলাফল বিবেচনা করিবার সময় নাই, কিন্তু তাহাতে আমাদের আত্মসম্মান বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা জানিতাম, আমাদের স্বদেশ-শাসনের বিপুল ব্যাপারে আমরা অকর্মণ্য নিশ্চেষ্ট নহি; ইহার মধ্যে আমাদেরও কর্তব্য, আমাদেরও দায়িত্ব আছে। এই শাসনকার্যের উপর যখন প্রধানত আমাদের সুখদুঃখ আমাদের শুভ-অশুভ নির্ভর করিতেছে,তখন তাহার সহিত আমাদের কোনো মন্তব্য কোনো বক্তব্য কোনো কর্তব্যবন্ধনের যোগ না থাকিলে আমাদের দীনতা আমাদের হীনতার আর অবধি থাকে না। বিশেষত আমরা ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছি, ইংরাজি সাহিত্য হইতে ইংরাজ কর্মবীরগণের দৃষ্টান্ত আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্বপ্রকার ব্যাপারেই নিজের শুভসাধনে আমাদের নিজের স্বাধীন অধিকার থাকার যে পরম গৌরব তাহা আমরা অনুভব করিয়াছি। আজ যদি অকস্মাৎ আমরা সেই ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হই, রাজকার্যচালনার সহিত আমাদের সমালোচনার ক্ষুদ্র সম্বন্ধটুকুও এক আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং হয় আমরা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকি নয় কপটতা ও মিথ্যা বাক্যের দ্বারা প্রবলতার রাজপদতলে আপন মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ বলিদান করি, তবে পরাধীনতার সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আকাঙক্ষার বাক্যহীন ব্যর্থ বেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের দুর্দশা পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইবে; যে সম্বন্ধের মধ্যে

আদানপ্রদানের একটি সংকীর্ণ পথ খোলা ছিল, ভয় আসিয়া সে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে; রাজার প্রতি প্রজার সে ভয় গৌরবের নহে, এবং প্রজার প্রতি রাজার সে ভয় ততোধিক শোচনীয়।

এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল এক মূহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে। আজকালকার কোনো কোনো জবর্‌দস্ত ইংরাজ লেখক বলেন, যাহা সত্য তাহা অনাবৃত হইয়া থাকাই ভালো। কিন্তু, আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজ-শাসনে এই কঠিন শুষ্ক পরাধীনতার কঙ্কালই কি একমাত্র সত্য, ইহার উপরে জীবনের লাবণ্যের যে আবরণ, স্বাধীন গতিভঙ্গির যে বিচিত্র লীলা, মনোহর শ্রী অর্পণ করিয়াছিল তাহাই কি মিথ্যা, তাহাই কি মায়া! দুই শত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানবসম্বন্ধের এই কি অবশেষ!

১৩০৫

ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্

বিলাতে ইম্পীরিয়লিজ্‌মের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীন দেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন। বিশ্বামিত্র একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন, বাইবেল-কথিত কোনো রাজা স্বর্গের প্রতি স্পর্ধা করিয়া এক স্তম্ভ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,স্বয়ং দশাননের সম্বন্ধেও এরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

দেখা যাইতেছে, এইরূপ বড়ো বড়ো মতলব পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক লোকে মনে মনে আঁটিয়াছে। এ-সকল মতলব টেঁকে না; কিন্তু নষ্ট হইবার পূর্বে পৃথিবীতে কিছু অমঙ্গল না সাধিয়া যায় না।

তাঁহাদের দেশের এই খেয়ালের ঢেউ লর্ড্‌ কার্জনের মনের মধ্যেও যে তোলপাড় করিতেছে সেদিনকার এক অলক্ষণে বক্তৃতায় তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন। দেখিয়াছি, আমাদের দেশের কোনো কোনো খবরের কাগজ কখনো কখনো এই বিষয়টাতে একটু উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বেশ কথা, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ “এম্পায়ারে’ একাত্ম হইবার অধিকার দাও-না।

কথার ছল ধরিয়া তো কোনো অধিকার পাওয়া যায় না। এমন-কি, লেখাপড়া পাকা কাগজে হইলেও দুর্বল লোকের পক্ষে নিজের স্বত্ব উদ্ধার করা শক্ত। এই কারণে যখন দেখিতে পাই যাঁহারা আমাদের উপরওয়ালা তাঁহারা ইম্পীরিয়ল্‌বায়ুগ্রস্ত, তখন মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করি না।

পাঠকেরা বলিতে পারেন, তোমার অত ভয় করিবার প্রয়োজন কী। যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে ব্যক্তি ইম্পীরিয়লিজ্‌মের বুলি আওড়াক বা নাই আওড়াক, তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করিলে সে তো অনায়াসে করিতে পারে।

অনায়াসে করিতে পারে না। কেননা, হাজার হইলেও দয়াধর্ম একেবারে ছাড়া কঠিন। লজ্জাও একটা আছে। কিন্তু একটা বড়ো-গোছের বুলি যদি কাহাকেও পাইয়া বসে তবে তাহার পক্ষে নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় সহজ হইয়া উঠে।

অনেক লোকে জন্তুকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে পীড়া বোধ করে। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার একটা নাম যদি দেওয়া যায় “শিকার’ তবে সে ব্যক্তি আনন্দের সহিত হত-আহত নিরীহ পাখির তালিকা বৃদ্ধি করিয়া গৌরব বোধ করে। নিশ্চয়ই, বিনা উপলক্ষে যে ব্যক্তি পাখির ডানা ভাঙিয়া দেয় সে ব্যক্তি শিকারির চেয়ে নিষ্ঠুর, কিন্তু পাখির তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা নাই। বরঞ্চ অসহায় পক্ষিকুলের পক্ষে স্বভাবনিষ্ঠুরের চেয়ে শিকারির দল অনেক বেশি নিদারুণ।

যাঁহারা ইম্পীরিয়লিজ্‌মের খেয়ালে আছেন তাঁহারা দুর্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর নানা দিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।

রাশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড্‌-পোল্যাণ্ড্‌কে নিজের বিপুল কলেবরের সহিত একেবারে বেমালুম মিশাইয়া লইবার জন্য যে কী পর্যন্ত চাপ দিতেছে তাহা সকলেই জানেন। এতদূর পর্যন্ত কখনোই সম্ভব হইত না যদি- না রাশিয়া মনে করিত, তাহার অধীন দেশের স্বাভাবিক বৈষম্যগুলি জবর্‌দস্তির সহিত দূর করিয়া দেওয়াই ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌-নামক একটা সর্বাঙ্গীণ বৃহৎ স্বার্থের

পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থকে রাশিয়া পোল্যাণ্ড্-ফিন্‌ল্যাণ্ডেরও স্বার্থ বলিয়া গণ্য করে।

লড্ কার্জনও সেইভাবেই বলিতেছেন, জাতীয়তার কথা ভুলিয়া এম্পায়ারের স্বার্থকে তোমাদের নিজের স্বার্থ করিয়া তোলো।

কোনো শক্তিমানের কানে এ কথা বলিলে তাহার ভয় পাইবার কারণ নাই; কেননা, শুধু কথায় সে ভুলিবে না। বস্তুতই তাহার স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় সপ্রমাণ হওয়া চাই। অর্থাৎ, সে স্থলে তাহাকে দলে টানিতে গেলে নিজের স্বার্থও যথেষ্ট পরিমাণে বিসর্জন না দিলে তাহার মন পাওয়া যাইবে না। অতএব,সেখানে অনেক মধু ঢালিতে হয়, অনেক তেল খরচ না করিয়া চলে না।

ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরাজ ক্রমাগতই তাহাদের কানে মন্ত্র আওড়াইতেছে, “যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব’; কিন্তু তাহারা শুধু মন্ত্রে ভুলিবার নয়- পণের টাকা গণিয়া দেখিতেছে।

হতভাগ্য আমাদের বেলায় মন্ত্রেরও কোনো প্রয়োজন নাই, পণের কড়ি তো দূরে থাক্।

আমাদের বেলায় বিচার্য এই যে, বিদেশীয়ের সহিত ভেদবুদ্ধির জাতীয়তার পক্ষে আবশ্যক, কিন্তু ইম্পীরিয়লিজ্‌মের পক্ষে প্রতিকূল- অতএব এই ভেদবুদ্ধির যে-সকল কারণ আছে সেগুলাকে উৎপাটন করা কর্তব্য।

কিন্তু সেটা করিতে গেলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে-একটা ঐক্য জমিয়া উঠিতেছে সেটাকে কোনোমতে জমিতে না দেওয়াই শ্রেয়। সে যদি খণ্ড খণ্ড চূর্ণ চূর্ণ অবস্থাতেই থাকে তবে তাহাকে আত্মসাৎ করা সহজ।

সূচিপত্র

ভারতবর্ষের মতো এতবড়ো দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গৌরব আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখা ইংরাজের মতো অভিমানীজাতির পক্ষে লজ্জার কথা।

কিন্তু ইম্পীরিয়লিজ‌্ম্-মন্ত্রে লজ্জা দূর হয়। ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থলাভ তখন সেই মহদুদ্দেশ্যে ইহাকে জাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই "হিয়ুম্যানিটি' !

ভারতবর্ষের কোনো স্থানে তাহার স্বাধীন শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া ইংরেজ-সভ্যনীতি অনুসারে নিশ্চয়ই লজ্জাকর; কিন্তু যদি মন্ত্র বলা যায় "ইম্পীরিয়লিজ‌্ম্', তবে যাহা মনুষ্যত্বের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্রনীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গৌরব হইয়া উঠিতে পারে।

নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কতবড়ো অধর্ম, কী প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই অধর্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একট বড়ো বুলির ছায়া লইতে হয়।

সেসিল রোড্স্ একজন ইম্পীরিয়ল্‌বায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন; সেইজন্য দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বোয়ারদের স্বাতন্ত্র্য লোপ করিবার জন্য তাঁহাদের দলের লোকের কিরূপ আগ্রহ ছিল তাহা সকলেই জানেন।

ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে-সকল কাজকে চৌর্য মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল খুন ডাকতি নাম দেয়, একটা ইজ্‌ম্-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দে তাহাকে শোধন

করিয়া কতদূর গৌরবের বিষয় করিয়া তোলে, বিলাতি ইতিহাসের মান্যব্যক্তিদের চরিত্র হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইজন্য আমাদের কর্তাদের মুখ হইতে ইম্পীরিয়লিজ্‌মের আভাস পাইলে আমরা সুস্থির হইতে পারি না। এতবড়ো রথের চাকার তলে যদি আমাদের মর্মস্থান পিষ্ট হয় তবে ধর্মের দোহাই দিলে কাহারও কর্ণগোচর হইবে না। কারণ, পাছে কাজ ভণ্ডুল করিয়া দেয় এই ভয়ে মানুষ তাহার বৃহৎ ব্যাপারগুলিতে ধর্মকে আমল দিতে চাহে না।

প্রাচীন গ্রীসের প্রবল এথীনিয়ান্‌গণ যখন দুর্বল মেলিয়ান্‌দের দ্বীপটি অন্যায় নিষ্ঠুরতার সহিত গ্রহণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল তখন উভয় পক্ষে কিরূপ বাদানুবাদ হইয়াছিল গ্রীক ইতিহাসবেত্তা থুকিদিদীস তাহার একটা নমুনা দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌তত্ত্ব য়ুরোপে কত প্রাচীন এবং যে পলিটিক্‌সের ভিত্তির উপরে য়ুরোপীয় সভ্যতা গঠিত তাহার মধ্যে কিরূপ নিদারুণ ক্রূরতা প্রচ্ছন্ন আছে।

Athenians. Put you and we should say what we really think, and aim only at what is possible, for we both alike know that into the discussion of human affairs the question of justice only enters where the pressure of necessity is equal, and that the powerful exact what they can, and the weak grant what they must. ll.And we will now endeavour to show that we have come in the interests of our empire and that in what we are about to say we are only seeking the preservation of your city. For we want to make you ours with the least trouble to ourselves and it is for the interest of us both that you should not be destroyed.

Mel.It may be your interest to be our masters,

but how can it be ours to be your slaves ?

Ath.To you the gain will be that by submission you will avert the worst; and we shall be all the richer for your preservation.

১৩১২

রাজভক্তি

রাজপুত্র আসিলেন। রাজ্যের যত পাত্রের পুত্র তাঁহাকে গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া বসিল– তাহার মধ্যে একটু ফাঁক পায় এমন সাধ্য কাহারো রহিল না। এই ফাঁক যতদূর সম্ভব সংকীর্ণ করিবার জন্য কোটালের পুত্র পাহারা দিতে লাগিল– সেজন্য সে শিরোপা পাইল। তাহার পর? তাহার পর বিস্তর বাজি পুড়াইয়া রাজপুত্র জাহাজে চড়িয়া চলিয়া গেলেন– এবং আমার কথাটি ফুরাল, নটেশাকটি মুড়াল।

ব্যাপারখানা কী। একটি কাহিনী মাত্র। রাজ্য ও রাজপুত্রের এই বহুদুর্লভ মিলন যত সুদূর, যত স্বল্প, যত নিরর্থক হওয়া সম্ভব তাহা হইল। সমস্ত দেশ পর্যটন করিয়া দেশকে যত কম জানা, দেশের সঙ্গে যত কম যোগস্থাপন হইতে পারে, তাহা বহু ব্যয়ে বহু নৈপুণ্য ও সমারোহ-সহকারে সমাধা হইল।

অবশ্যই রাজপুরুষেরা ইহার মধ্যে কিছু-একটা পলিসি, কিছু-একটা প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন; নহিলে এত বাজে খরচ করিবেন কেন। রূপকথার রাজপুত্র কোনো সুপ্ত রাজকন্যাকে জাগাইবার জন্য সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়াছিলেন; আমাদের রাজপুত্রও বোধ করি সুপ্ত রাজভক্তিকে জাগাইবার জন্যই যাত্রা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সোনার কাঠি কি মিলিয়াছিল।

নানা ঘটনায় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমাদের রাজপুরুষেরা সোনার কাঠির চেয়ে লোহার কাঠির উপরেই বেশি আস্থা রাখিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতাপের আড়ম্বরটাকেই তাঁহারা বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের মতো ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চোখের উপর দিয়া ঝলকিয়া লইয়া যান। তাহাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়, হৃৎকম্পও হইতে পারে, কিন্তু রাজাপ্রজার মধ্যে অন্তরের বন্ধন দৃঢ় হয় না– পার্থক্য আরো বাড়িয়া যায়।

সূচিপত্র

ভারতবর্ষের অদৃষ্টে এইরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, এখানকার রাজাসনে যাঁহারা বসেন তাঁহাদের মেয়াদ বেশিদিনকার নহে, অথচ এখানে রাজক্ষমতা যেরূপ অত্যুৎকট স্বয়ং ভারতসম্রাটেরও সেরূপ নহে। বস্তুত ইংলণ্ডে রাজত্ব করিবার সুযোগ কাহারো নাই; কারণ, সেখানে প্রজাগণ স্বাধীন। ভারতবর্ষ যে অধীন রাজ্য তাহা ইংরাজ এখানে পদার্পণ করিবামাত্র বুঝিতে পারে। সুতরাং এ দেশে কর্তৃত্বের দম্ভ, ক্ষমতার মত্ততা, সহসা সম্বরণ করা ক্ষুদ্রপ্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বনিয়াদি রাজাকে রাজকীয় নেশায় টলাইতে পারে না। হঠাৎ-রাজার পক্ষে এই নেশা একেবারে বিষ। ভারতবর্ষে যাঁহারা কর্তৃত্ব করিতে আসেন তাঁহারা অধিকাংশই এই মদিরায় অভ্যস্ত নহেন। তাঁহাদের স্বদেশ হইতে এ দেশের পরিবর্তন অত্যন্ত বেশি। যাঁহারা কোনোকালেই বিশেষ-কেহ নহেন, এখানে তাঁহারা এক- মুহূর্তেই হর্তাকর্তা। এমন অবস্থায় নেশার ঝোঁকে এই নূতন-লব্ধ প্রতাপটাকেই তাঁহারা সকলের চেয়ে প্রিয় এবং শ্রেয় জ্ঞান করেন।

প্রেমের পথ নম্রতার পথ। সামান্য লোকেরও হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে নিজের মাথাটাকে তাহার দ্বারের মাপে নত করিতে হয়। নিজের প্রতাপ ও প্রেস্টিজ সম্বন্ধে যে ব্যক্তি হঠাৎ-নবাবের মতো সর্বদাই আপাদমস্তক সচেতন সে ব্যক্তির পক্ষে এই নম্রতা দুঃসাধ্য। ইংরাজের রাজত্ব যদি ক্রমাগতই আনাগোনার রাজত্ব না হইত, যদি এ দেশে তাহারা স্থায়ী হইয়া কর্তৃত্বের উগ্রতাটা কতকটা পরিমাণে সহ্য করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমাদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ-স্থাপনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের অখ্যাত প্রান্ত হইতে কয়েক দিনের জন্য এ দেশে আসিয়া ইহারা কোনোমতেই ভুলিতে পারে না যে “আমরা কর্তা’- এবং সেই ক্ষুদ্র দম্ভটাকেই সর্বদা প্রকাশমান রাখিবার জন্য তাহারা

আমাদিগকে সকল বিষয়েই অহরহ দূরে ঠেকাইয়া রাখে এবং কেবলমাত্র প্রবলতার দ্বারা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা যে তাহাদের রাজনীতিকে স্পর্শ করিতে পারে, এ কথা তাহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। এমন-কি, তাহাদের কোনো বিধানে আমরা যে বেদনা অনুভব ও বেদনা প্রকাশ করিব তাহাও তাহারা স্পর্ধা বলিয়া জ্ঞান করে।

কিন্তু স্বামী যতই কঠোর হউক-না কেন, সে স্ত্রীর কাছে যে কেবল বাধ্যতা চাহে তাহা নহে, স্ত্রীর হৃদয়ের প্রতিও তাহার ভিতরে ভিতরে আকাঙক্ষা থাকে। অথচ হৃদয় অধিকার করিবার ঠিক পথটি সে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার দুর্নম্য ঔদ্ধত্যে বাধা দেয়। যদি তাহার সন্দেহ জন্মে যে, স্ত্রী তাহার আধিপত্য সহ্য করে, কিন্তু তাহাকে ভালোবাসে না, তবে সে তাহার কঠোরতার মাত্র বাড়াইতেই থাকে। প্রীতি জন্মাইবার ইহা যে প্রকৃষ্ট উপায় নহে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সেইরূপ ভারতবর্ষের ইংরাজ-রাজারা আমাদের কাছ হইতে রাজভক্তির দাবিটুকুও ছাড়িতে পারে না। কিন্তু ভক্তির সম্বন্ধ হৃদয়ের সম্বন্ধ; সে সম্বন্ধে দান-প্রতিদান আছে- তাহা কলের সম্বন্ধ নহে। সে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই কাছে আসিতে হয়, তাহা শুদ্ধমাত্র জবর্‌দস্তির কর্ম নহে। কিন্তু কাছেও ঘেঁষিব না, হৃদয়ও দিব না, অথচ রাজভক্তিও চাই। শেষকালে সেই ভক্তি সম্বন্ধে যখন সন্দেহ জন্মে তখন গুর্খা লাগাইয়া, বেত চালাইয়া, জেলে দিয়া ভক্তি আদায় করিতে ইচ্ছা হয়।

ইংরাজ শাসনের কল চালাইতে চালাইতে হঠাৎ এক-একবার রাজভক্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, কার্জনের আমলে তাহার একটা নমুনা পাওয়া গিয়াছিল।

স্বাভাবিক আভিজাত্যের অভাবে লর্ড্ কার্জন কর্তৃত্বের নেশায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট অনুভব করা গিয়াছিল। এ গদি ছাড়িতে তাঁহার কিছুতেই মন সরিতেছিল না। এই রাজকীয় আড়ম্বর হইতে অবসৃত হইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা "খোঁয়ারি'-গ্রস্ত মাতালের মতো আজ যে অবস্থায় আছে তাহা যদি আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিতাম তবে বাঙালিও বোধ হয় আজ তাঁহাকে দয়া করিতে পারিত। এরূপ আধিপত্যলোলুপতা বোধ করি ভারতবর্ষের আর-কোনো শাসনকর্তা এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই লাটসাহেবটি ভারতবর্ষের পুরাতন বাদশাহের ন্যায় দরবার করিবেন স্থির করিলেন, এবং স্পর্ধাপূর্বক দিল্লিতে সেই দরবারের স্থান করিলেন।

কিন্তু প্রাচ্যরাজামাত্রই বুঝিতেন, দরবার স্পর্ধাপ্রকাশের জন্য নহে; দরবার রাজার সহিত প্রজাদের আনন্দসম্মিলনের উৎসব। সেদিন কেবল রাজোচিত ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রজাদিগকে স্তম্ভিত করা নয়, সেদিন রাজোচিত ঔদার্যের দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিবার দিন। সেদিন ক্ষমা করিবার, দান করিবার, রাজশাসনকে সুন্দর করিয়া সাজাইবার শুভ অবসর।

কিন্তু পশ্চিমের হঠাৎ-নবাব দিল্লির প্রাচ্য-ইতিহাসকে সম্মুখে রাখিয়া এবং বদান্যতাকে সওদাগরি কার্পণ্য দ্বারা খর্ব করিয়া কেবল প্রতাপকেই উগ্রতর করিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বস্তুত ইংরাজের রাজশ্রী আমাদের কাছে গৌরব লাভ করে নাই। ইহাতে দরবারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেছে। এই দরবারের দুঃসহ দর্পে প্রাচ্যহৃদয় পীড়িত হইয়াছে, দেশমাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। সেই প্রচুর অপব্যয় যদি কিছুমাত্র ফল রাখিয়া থাকে, তবে তাহা অপমানের স্মৃতিতে। লোহার কাঠির দ্বারা সোনার কাঠির কাজ সারিবার চেষ্টা যে নিষ্ফল তাহা নহে, তাহাতে উল্টা ফল হইয়া থাকে।

এবারে রাজপুত্রকে ভারতবর্ষে আনা হইল। রাজনীতির তরফ হইতে পরামর্শ উত্তম হইয়াছে। কারণ, সাধারণত রাজবংশীয়ের প্রতি ভারতবর্ষীয় হৃদয়ের অভিমুখিতা বহুকালের প্রকৃতিগত। সেইজন্য দিল্লির দরবারে ড্যুক অফ কনট থাকিতে কার্জনের দরবারতক্ত-গ্রহণ ভারতবর্ষীয়মাত্রকেই বাজিয়াছিল। এরূপ স্থলে ড্যুকের উপস্থিত থাকাই উচিত ছিল না। বস্তুত প্রজাগণের ধারণা হইয়াছিল যে, কার্জন নিজের দম্ভ প্রচার করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক দরবারে ড্যুক অফ কনটের উপস্থিতি ঘটাইয়াছিলেন। আমরা বিলাতি কায়দা বুঝি না, বিশেষত দরবার-ব্যাপারটাই যখন বিশেষভাবে প্রাচ্য তখন এ উপলক্ষে রাজবংশের প্রকাশ্য অবমাননা অন্তত পলিসি-সংগত হয় নাই।

যাই হোক, ভারতবর্ষের রাজভক্তিকে নাড়া দিবার জন্য একবার রাজপুত্রকে সমস্ত দেশের উপর দিয়া বুলাইয়া লওয়া উচিত- বোধ করি এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইংরেজ হৃদয়ের কারবার কোনোদিন করে নাই। তাহারা এ দেশকে হৃদয় দেয়ও নাই, এ দেশের হৃদয় চায়ও নাই, দেশের হৃদয়টা কোথায় আছে তাহার খবরও রাখে না। ইহারা রাজপুত্রের ভারতবর্ষে আগমন-ব্যাপারটাকে যত স্বল্পফলপ্রদ করা সম্ভব তাহা করিল। আজ রাজপুত্র ভারতবর্ষের মাটি ছাড়িয়া জাহাজে উঠিতেছেন, আর আমাদের মনে হইতেছে যেন একটা স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, যেন একটা রূপকথা শেষ হইল। কিছুই হইল না- মনে রাখিবার কিছু রহিল না, যাহা যেমন ছিল তাহা তেমনি রহিয়া গেল।

ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত, এ কথা সত্য। হিন্দু-ভারতবর্ষের রাজভক্তির একটু বিশেষত্ব আছে। হিন্দুরা রাজাকে দেবতুল্য ও রাজভক্তিকে ধর্মস্বরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যগণ এ কথার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে

পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, ক্ষমতার কাছে এইরূপ অবনত হওয়া আমাদের স্বাভাবিক দীন চরিত্রের পরিচয়।

সংসারের অধিকাংশ সম্বন্ধকেই হিন্দু দৈবসম্বন্ধ না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। হিন্দুর কাছে প্রায় কিছুই আকস্মিক সম্বন্ধ নহে। কারণ, হিন্দু জানে, আমাদের কাছে প্রকাশ যতই বিচিত্র ও বিভিন্ন হউক না, মূলশক্তি একই। ভারতবর্ষে ইহা কেবলমাত্র একটা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, ইহা ধর্ম- ইহা পুঁথিতে লিখিবার, কালেজে পড়াইবার নহে- ইহা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে উপলব্ধি ও জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারে প্রতিফলিত করিবার। আমরা পিতামাতাকে দেবতা বলি, স্বামীকে দেবতা বলি, সতী স্ত্রীকে লক্ষ্মী বলি। গুরুজনকে পূজা করিয়া আমরা ধর্মকে তৃপ্ত করি। ইহার কারণ, যে-কোনো সম্বন্ধের মধ্য হইতে আমরা মঙ্গললাভ করি সেই সম্বন্ধের মধ্যেই আমরা আদি মঙ্গলশক্তিকে স্বীকার করিতে চাই। সেই-সকল উপলক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মঙ্গলময়কে সুদূর স্বর্গে স্থাপনপূর্বক পূজা করা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। পিতামাতাকে যখন আমরা দেবতা বলি তখন এ মিথ্যাকে আমরা মনে স্থান দিই না যে, তাঁহারা বিশ্বভুবনের ঈশ্বর বা তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি আছে। তাঁহাদের দৈন্য দুর্বলতা, তাঁহাদের মনুষ্যত্ব সমস্তই আমরা নিশ্চিত জানি, কিন্তু ইহাও সেইরূপ নিশ্চিত জানি যে, ইঁহারা পিতামাতারূপে আমাদের যে কল্যাণ সাধন করিতেছেন সেই পিতৃমাতৃত্ব জগতের পিতামাতারই প্রকাশ । ইন্দ্র-চন্দ্র-অগ্নি-বায়ুকে যে বেদে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তাহারও এই কারণ। শক্তিপ্রকাশের মধ্যে ভারতবর্ষ শক্তিমান পুরুষের সত্তা অনুভব না করিয়া কোনোদিন তৃপ্ত হয় নাই। এইজন্য বিশ্বভুবনে নানা উপলক্ষে নানা আকারেই ভক্তিবিনম্র ভারতবর্ষের পূজা সমাহৃত হইয়াছে। জগৎ আমাদের নিকট সর্বদাই দেবশক্তিতে সজীব।

এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, আমরা দীনতাবশতই প্রবলতার পূজা করিয়া থাকি। সকলেই জানে,গাভীকেও ভারতবর্ষ পূজ্য করিয়াছে। গাভী যে পশু তাহা সে জানে না ইহা নহে। মানুষ প্রবল এবং গাভীই দুর্বল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজ গাভীর নিকট হইতে নানাপ্রকার মঙ্গল লাভ করে। সেই মঙ্গল মানুষ যে নিজের গায়ের জোরে পশুর কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতেছে এই ঔদ্ধত্য ভারতবর্ষের নহে। সমস্ত মঙ্গলের মূলে সে দৈব অনুগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলের সঙ্গে আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে তবে বাঁচে। কারিকর তাহার যন্ত্রকে প্রণাম করে, যোদ্ধা তাহার তরবারিকে প্রণাম করে, গুণী তাহার বীণাকে প্রণাম করে। ইহারা যে যন্ত্রকে যন্ত্র বলিয়া জানে না তাহা নহে; কিন্তু ইহাও জানে, যন্ত্র একটা উপলক্ষমাত্র– যন্ত্রের মধ্য হইতে সে যে আনন্দ বা উপকার লাভ করিতেছে তাহা কাঠ বা লোহার দান নহে; কারণ, আত্মাকে আত্মীয় ছাড়া কোনো সামগ্রীমাত্রে স্পর্শ করিতে পারে না। এইজন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা, তাহাদের পূজা, যিনি বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী তাঁহার নিকট এই যন্ত্রযোগেই সমর্পিত হয়।

এই ভারতবর্ষ রাজশাসন-ব্যাপারকে যদি পুরুষরূপে নহে, কেবল যন্ত্ররূপে অনুভব করিতে থাকে, তবে তাহার পক্ষে এমন পীড়াকর আর-কিছুই হইতে পারে না। জড়ের মধ্যেও আত্মার সম্পর্ক অনুভব করিয়া তবে যাহার তৃপ্তি হয়, রাষ্ট্রতন্ত্রের মতো এতবড়ো মানব-ব্যাপারের মধ্যে সে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবকে মূর্তিমান না দেখিয়া বাঁচে কিরূপে। আত্মার সঙ্গে আত্মীয়ের সম্বন্ধ যেখানে আছে সেখানেই নত হওয়া যায়; যেখানে তাহা নাই সেখানে নত হইতে অহরহ বাধ্য হইলে অপমান ও পীড়া বোধ হয়। অতএব রাষ্ট্রব্যাপারের মধ্যস্থলে আমরা দেবতার শক্তিকে, মঙ্গলের প্রত্যক্ষস্বরূপকে রাজরূপে দেখিতে পাইলে শাসনের বিপুল ভার সহজে বহন করিতে পারি; নহিলে হৃদয় প্রতিক্ষণেই ভাঙিয়া যাইতে থাকে। আমরা পূজা করিতে চাই– রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত আমাদের প্রাণের যোগ

অনুভব করিতে চাই- আমরা বলকে কেবলমাত্র বলরূপে সহ্য করিতে পারি না।

অতএব ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত এ কথা সত্য। কিন্তু সেইজন্য রাজা তাহার পক্ষে শুদ্ধমাত্র তামাশার রাজা নহে। রাজাকে সে একটা অনাবশ্যক আড়ম্বরের অঙ্গরূপে দেখিতে ভালোবাসে না। সে রাজাকে যথার্থ সত্যরূপে অনুভব করিতেই ইচ্ছা করে। সে রাজাকে বহুকাল ধরিয়া পাইতেছে না বলিয়া উত্তরোত্তর পীড়িত হইয়া উঠিতেছে। ক্ষণস্থায়ী বহু রাজার দুঃসহ ভারে এই বৃহৎ দেশ কিরূপে মর্মে মর্মে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিদিন কিরূপ নিরুপায়ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া কেহ দেখিবার নাই। যাহারা পথিকমাত্র, ছুটির দিকেই যাহাদের মন পড়িয়া আছে, যাহারা পেটের দায়ে নির্বাসনে দিন যাপন করিতেছে, যাহারা বেতন লইয়া এই শাসন-কারখানার কল চালাইয়া যাইতেছে, যাহাদের সহিত আমাদের সামাজিক কোনো সম্বন্ধ নাই- অহরহ পরিবর্তমান এমন উপেক্ষাপরায়ণ জনসম্প্রদায়ের হৃদয়সম্পর্কশূন্য আপিসি-শাসন নিরন্তর বহন করা যে কী দুর্বিষহ তাহার ভারতবর্ষই জানে। রাজভক্তিতে দীক্ষিত ভারতবর্ষের অন্তঃকরণ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে, হে ভারতের প্রতি বিমুখ ভগবান, আমি এই-সকল ক্ষুদ্র রাজা, ক্ষণিক রাজা, অনেক রাজা আর সহিতে পারি না, আমাকে এক রাজা দাও। এমন রাজা দাও যিনি বলিতে পারিবেন ভারতবর্ষ আমারই রাজ্য- বণিকের নয়, খনিকের নয়, চা-করের নয়, ল্যাঙ্কাশিয়রের নয়। ভারতবর্ষ যাঁহাকে অন্তরের সহিত বলিতে পারিবে, আমারই রাজা; হ্যালিডে রাজা নয়, ফুলর রাজা নয়; পায়োনিয়র-সম্পাদক রাজা নয়। রাজপুত্র আসুন, ভারতের রাজতক্তে বসুন, তাহা হইলে স্বভাবতই তাঁহার নিকট ভারতবর্ষই মুখ্য এবং ইংলণ্ড্ গৌণ হইয়া উঠিবে। তাহাতেই ভারতের মঙ্গল এবং ইংলণ্ডের স্থায়ী লাভ। কারণ, মানুষকে কল দিয়া শাসন করিব, তাহার সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক, সমাজের সম্পর্ক রাখিব না, এ স্পর্ধা

ধর্মরাজ কখনোই চিরদিন সহ্য করিতে পারেন না- ইহা স্বাভাবিক নহে, ইহা বিশ্ববিধানকে পীড়িত করিতে থাকে। সেইজন্য, সুশাসনই বল, শান্তিই বল, কিছুর দ্বারাই এই দারুণ হৃদয়দুর্ভিক্ষ পূরণ হইতে পারে না। এ কথা শুনিয়া আইন ক্রুদ্ধ হইতে পারে, পুলিস-সর্প ফণা তুলিতে পারে; কিন্তু যে ক্ষুধিত সত্য ত্রিশ কোটি প্রজার মর্মের মধ্যে হাহাকার করিতেছে তাহাকে বলের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারে এমন শাসনের উপায় কোনো মানবের হাতে নাই, কোনো দানবের হাতে নাই।

ভারতবর্ষীয় প্রজার এই-যে হৃদয় প্রত্যহ ক্লিষ্ট হইতেছে, ইহাকেই কতকটা সান্ত্বনা দিবার জন্য রাজপুত্রকে আনা হইয়াছিল। আমাদিগকে দেখানো হইয়াছিল যে, আমাদেরও রাজা আছে। কিন্তু মরীচিকার দ্বারা সত্যকার তৃষ্ণা দূর হয় না।

বস্তুত আমরা রাজশক্তিকে নহে- রাজহৃদয়কে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ও প্রত্যক্ষ রাজাকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে চাই। ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়াই যে প্রজার চরম চরিতার্থতা, প্রভুগণ, এ কথা মনেও করিয়ো না। তোমরা আমাদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞা কর বলিয়াই তোমরা বলিয়া থাক, ইহারা শান্তিতে আছে তবু ইহারা আর কী চায়। ইহা জানিয়ো হৃদয়ের দ্বারা মানুষের হৃদয়কে বশ করিলে সে ধনপ্রাণ স্বেচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করিতে পারে, ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। শান্তি নহে, মানুষ তৃপ্তি চাহে, এবং দৈব আমাদের প্রতি যতই বিরূপ হউন, আমরা মানুষ। আমাদেরও ক্ষুধা দূর করিতে হইলে সত্যকার অন্নেরই প্রয়োজন হয়- আমাদের হৃদয় বশ করা ফুলর, প্যুনিটিভ পুলিস এবং জোর-জুলুমের কর্ম নহে।

দেবই হউন আর মানবই হউন, লাটই হউন আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার

মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা, আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই-সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্ধ্বে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখো, এই-সমস্ত বড়ো বড়ো নামধারী মিথ্যাকে তোমরা সর্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার করো; ইহারা যেন বিভীষিকার মুখোশ পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সংকুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা উজ্জ্বলতা পরম-শক্তিমত্তার কাছে এই-সমস্ত তর্জন গর্জন, এই-সমস্ত উচ্চপদের অভিমান, এই-সমস্ত শাসন-শোষণের আয়োজন-আড়ম্বর তুচ্ছ ছেলেখেলা মাত্র। ইহারা যদি-বা তোমাকে পীড়া দেয়, তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেইখানেই নত হওয়ায় গৌরব; যেখানে সে সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক, অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিয়ো, ঋজু রাখিয়ো, দীনতা স্বীকার করিয়ো না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ো, নিজের প্রতি অক্ষুন্ন আস্থা রাখিয়ো। কারণ, নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে, সেইজন্য বহু দুঃখেও তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হও নাই। অন্যের বাহ্য অনুকরণের চেষ্টা করিয়া তুমি যে এতকাল পরে একটা ঐতিহাসিক প্রহসন রচনা করিবার জন্য এতদিন বাঁচিয়া আছ তাহা কখনোই নহে। তুমি যাহা হইবে, যাহা করিবে, অন্য দেশের ইতিহাসে তাহার নমুনা নাই- তোমার যথাস্থানে তুমি বিশ্বভুবনের সকলের চেয়ে মহৎ। হে আমার স্বদেশ, মহাপর্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্রপরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। এই আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে। তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ করিবে তখন, আমি নিশ্চয় জানি, তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানের কি কর্মের কি ধর্মের অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে, এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল কালভুজঙ্গের বিদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইয়ো না, লুব্ধ হইয়ো না, ভীত হইয়ো না। তুমি

আত্মানং বিদ্ধি।
আপনাকে জানো।

এবং উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

উঠ, জাগো, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও,
যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধারশানিত দুর্গম দুরত্যয়, কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

১৩১২

বহুরাজকতা

সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তুলনা করিতে আমরা ছাড়ি না। সাবেক কাল যখন হাজির নাই তখন একতরফা বিচারে যাহা হইতে পারে তাহাই ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ বিচারকের মেজাজ অনুসারে কখনো-বা সেকালের ভাগ্যে যশ জোটে, কখনো-বা একালের জিত হয়। কিন্তু এমন বিচারের উপরে ভরসা রাখা যায় না।

আমাদের পক্ষে মোগলের আমল সুখের ছিল কি ইংরাজের আমল সুখের, গোটাকতক মোটা মোটা সাক্ষীর কথা শুনিয়াই তাহার শেষ-নিষ্পত্তি হইতে পারে না। নানা সূক্ষ্ম জিনিসের উপর মানুষের সুখদুঃখ নির্ভর করে, সে-সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখা সম্ভবপর নয়। বিশেষত যে কালটা গেছে সে আপনার অনেক সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে লইয়া গেছে।

কিন্তু সেকাল-একালের একটা মস্ত প্রভেদ ছোটোবড়ো আর-সমস্ত প্রভেদের উপরে মাথা তুলিয়া আছে। এই প্রভেদটা যেমন সকলের চেয়ে বড়ো তেমনি নিশ্চয়ই এই প্রভেদের ফলাফলও আমাদের দেশের পক্ষে সকলের চেয়ে গুরুতর। আমাদের এই ছোটো প্রবন্ধে আমরা সেই প্রভেদটির কথাই সংক্ষেপে পাড়িয়া দেখিতে চাই।

ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিল, তাহার পরে একটি কোম্পানি বসিয়াছিল, এখন একটি জাতি বসিয়াছে। আগে ছিল এক, এখন হইয়াছে অনেক। এ কথাটা এতই সোজা যে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোনো সূক্ষ্ম তর্কের প্রয়োজন হয় না।

সূচিপত্র

বাদশা যখন ছিলেন তখন তিনি জানিতেন, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁরই; এখন ইংরেজজাত জানে, ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটা রাজপরিবারমাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজজাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

খুব সম্ভব বাদশাহের অত্যাচার যথেষ্ট ছিল। এখন অত্যাচার নাই, কিন্তু বোঝা আছে। হাতির পিঠে মাহুত বসিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে অঙ্কুশ দিয়া মারে, হাতির পক্ষে তাহা সুখকর নহে। কিন্তু মাহুতের বদলে যদি আর-একটা গোটা হাতিকে সর্বদা বহন করিতে হইত তবে বাহকটি অঙ্কুশের অভাবকেই আপনার একমাত্র সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিত না।

একটিমাত্র দেবতার পূজার থালায় যদি ফুল সাজাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহা দেখিতে স্তূপাকার হইতে পারে, এবং যে ব্যক্তি ফুল আহরণ করিয়াছে তাহার পরিশ্রমটাও হয়তো অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়। কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতাকে একটা করিয়া পাপড়িও যদি দেওয়া যায় তবে তাহা চোখে দেখিতে যতই সামান্য হউক-না কেন, তলে তলে ব্যাপারখানা বড়ো কম হয় না। তবে কিনা, এই একটা একটা করিয়া পাপড়ির হিসাব এক জায়গায় সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া নিজের অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করার কথা মনেও উদয় হয় না।

কিন্তু, এখানে কাহাকেও বিশেষরূপে দায়ী করিবার কথা হইতেছে না। মোগলের চেয়ে ইংরাজ ভালো কি মন্দ তাহার বিচার করিয়া বিশেষ কোনো লাভ নাই। তবে কিনা, অবস্থাটা জানা চাই, তাহা হইলে অনেক বৃথা আশা ও বিফল চেষ্টার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সেও একটা লাভ।

মনে করো, এই-যে আমরা আক্ষেপ করিয়া মরিতেছি দেশের বড়ো বড়ো চাকরি প্রায় ইংরেজের ভাগ্যে পড়িতেছে, ইহার প্রতিকারটা কোন্‌খানে।

আমরা মনে করিতেছি, বিলাতে গিয়া যদি দ্বারে দ্বারে দুঃখ নিবেদন করিয়া ফিরি তবে একটা সদ্‌গতি হইতে পারে।

কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যাহার বিরুদ্ধে নালিশ আমরা তাহার কাছেই নালিশ করিতে যাইতেছি।

বাদশাহের আমলে আমরা উজির হইয়াছি, সেনাপতি হইয়াছি, দেশ শাসন করিবার ভার পাইয়াছি- এখন যে তাহা আমাদের আশার অতীত হইয়াছে ইহার কারণ কী। অন্য গূঢ় বা প্রকাশ্য কারণ ছাড়িয়া দাও, একটা মোটা কারণ আছে সে তো স্পষ্টই দেখিতেছি। ইংলণ্ড্ সমস্ত ইংরাজকে অন্ন দিতে পারে না, ভারতবর্ষে তাহাদের জন্য অন্নসত্র খোলা থাকা আবশ্যক। একটি জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে; সেই অন্ন নানারকম আকারে নানারকম পাত্রে জোগাইতে হইতেছে।

যদি সপ্তম এডোয়ার্ড্ যথার্থই আমাদের দিল্লির সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিতেন তবে তাঁহকে গিয়া বলিতে পারিতাম যে, হুজুর, অন্নের যদি বড়ো বড়ো গ্রাস সমস্তই বিদেশী লোকের পাতে পড়ে তবে তোমার রাজ্য টেঁকে কী করিয়া।

তখন সম্রাটও বলিতেন, তাই তো, আমার সাম্রাজ্য হইতে আমার ভোগের জন্য যাহা গ্রহণ করি তাহা শোভা পায়, কিন্তু তাই বলিয়া বারো ভূতে মিলিয়া পাত পাড়িয়া বসিলে চলিবে কেন।

তখন আমার রাজ্য বলিয়া তাঁহার দরদ বোধ হইত, এবং অন্যের লুব্ধ হস্ত ঠেকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু আজ প্রত্যেক ইংরেজই ভারতবর্ষকে “আমার রাজ্য’ বলিয়া জানে। এ রাজ্যে তাহাদের ভোগের খর্বতা ঘটিতে গেলেই

তাহারা সকলে মিলিয়া এমনি কলরব তুলিবে যে, তাহাদের স্বদেশীয় কোনো আইনকর্তা এ সম্বন্ধে কোনো বদল করিতে পারিবেই না।

এই আমাদের প্রকাণ্ড বহুসহস্রমুখবিশিষ্ট রাজার মুখের গ্রাসে ভাগ বসাইবার জন্য তাহারই কাছে দরবারে যাওয়া নিষ্ফল, এ কথা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

মোট কথা– একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে, ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই। অত্যন্ত ভালো রাজা হইলেও এরকম অবস্থায় রাজার বোঝা বহন করা দেশের পক্ষে বড়ো কঠিন। মুখ্যত অন্য দেশের এবং গৌণত আপনার স্বার্থ যে দেশকে একসঙ্গে সামলাইতে হয় তাহার অবস্থা বড়োই শোচনীয়। যে দেশের ভারকেন্দ্র নিজের এতটা বাহিরে পড়িয়াছে সে মাথা তুলিবে কী করিয়া। নাহয় চুরি ডাকাতি বন্ধ হইল, নাহয় আদালতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুবিচারই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বোঝা নামাইব কোথায়।

অতএব কন্‌গ্রেসের যদি কোনো সংগত প্রার্থনা থাকে তবে তাহা এই যে, সম্রাট এডোয়ার্ডের পুত্রই হউন, স্বয়ং লর্ড্‌ কার্জন বা কিচেনারই হউন, অথবা ইংলিশম্যান-পায়োনিয়রের সম্পাদকই হউন, ভালো মন্দ বা মাঝারি যে-কোনো একজন ইংরেজ বাছিয়া পার্লামেন্ট্‌ আমাদের রাজা করিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসাইয়া দিন। একটা দেশ যতই রসালো হউক-না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশসুদ্ধ রাজাকে পারে না।

১৩১২

পথ ও পাথেয়

জেলে প্রতিদিন জাল ফেলে, তাহার জালে মাছ ওঠে। একদিন জাল ফেলিতেই হঠাৎ একটা ঘড়া উঠিল, এবং ঘড়ার মুখ যেমন খুলিল অমনি তাহার ভিতর হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার আকার ধরিয়া একটা দৈত্য বাহির হইয়া পড়িল- আরব্য উপন্যাসে এমনি একটা গল্প আছে।

আমাদের খবরের কাগজ প্রতিদিন খবর টানিয়া আনে; কিন্তু তাহার জালে যে সেদিন এমন একটা ঘড়া ঠেকিবে এবং ঘড়ার মধ্য হইতে এতবড়ো একটা ত্রাসজনক ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িবে তাহা আমরা কোনোদিন প্রত্যাশাও করিতে পারি নাই।

নিতান্তই ঘরের দ্বারের কাছ হইতে এমন-একটা রহস্য হঠাৎ চক্ষের নিমেষে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িলে সমস্ত দেশের লোকের মনে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় সেই সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যের সময় কথার এবং আচরণের সত্যতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। জলে যখন ঢেউ উঠিতে থাকে তখন ছায়াটা আপনি বিকৃত হইয়া যায়, সেজন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারি না। অত্যন্ত ভয় এবং ভাবনার সময় আমাদের চিন্তা ও বাক্যের মধ্যে সহজেই বিকলতা ঘটে, অথচ ঠিক এইরূপ সময়েই অবিচলিত এবং নির্বিকার সত্যের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। প্রতিদিন অসত্য ও অর্ধসত্য আমাদের তত গুরুতর অনিষ্ট করে না, কিন্তু সংকটের দিনে তাহার মতো শত্রু আর কেহ নাই।

অতএব ঈশ্বর করুন, আজ যেন আমরা ভয়ে, ক্রোধে, আকস্মিক বিপদে, দুর্বল চিত্তের অতিমাত্র আক্ষেপে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে বা অন্যকে ভুলাইবার জন্য কেবল কতকগুলা ব্যর্থ বাক্যের ধুলা উড়াইয়া আমাদের চারি দিকের আবিল আকাশকে আরো অস্বচ্ছ করিয়া না তুলি। তীব্র বাক্যের দ্বারা

চাঞ্চল্যকে বাড়াইয়া তোলা হয়, ভয়ের দ্বারা সত্যকে কোনোপ্রকারে চাপা দিবার প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, অদ্যকার দিনে হৃদয়াবেগ-প্রকাশের উত্তেজনা সম্বরণ করিয়া যথাসম্ভব শান্তভাবে যদি বর্তমান ঘটনাকে বিচার না করি, সত্যকে আবিষ্কার ও প্রচার না করি, তবে আমাদের আলোচনা কেবল যে ব্যর্থ হইবে তাহা নহে, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবে।

আমাদের হীনাবস্থা বলিয়াই উপস্থিত বিভ্রাটের সময় কিছু অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে, “আমি ইহার মধ্যে নাই; এ কেবল অমুক দলের কীর্তি, এ কেবল অমুক লোকের অন্যায়; আমি পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি, এ-সব ভালো হইতেছে না; আমি তো জানিতাম, এমনি একটা ব্যাপার ঘটিবে। ’

কোনো আতঙ্কজনক দুর্ঘটনার পর এইপ্রকার অশোভন উৎকণ্ঠার সহিত পরের প্রতি অভিযোগ বা নিজের সুবুদ্ধি লইয়া অভিমান আমার কাছে দুর্বলতার পরিচয়, সুতরাং লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হয়। বিশেষত আমরা প্রবলের শাসনাধীনে আছি এইজন্য রাজপুরুষদের বিরাগের দিনে অন্যকে গালি দিয়া নিজেকে ভালো-মানুষের দলে দাঁড় করাইতে গেলে তাহার মধ্যে কেমন-একটা হীনতা আসিয়া পড়েই। অতএব দুর্বল পক্ষের এইরূপ ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতে না যাওয়াই ভালো।

তাহার পরে, যাহারা অপরাধ করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, নির্মম রাজদণ্ড যাহাদের ‘পরে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, আর-কিছু বিচার না করিয়া কেবলমাত্র বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ করাও কাপুরুষতা। তাহাদের বিচারের ভার এমন হাতে আছে যে, অনুগ্রহ বা মমত্ব সেই হাতকে লেশমাত্র দণ্ডলাঘবের দিকে বিচলিত করিবে না। অতএব ইহার উপরেও আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়া যোগ করিতে যাইব তাহাতে ভীরু স্বভাবের

নির্দয়তা প্রকাশ পাইবে। ব্যাপারটাকে আমরা যেমনি দোষাবহ বলিয়া মনে করি-না কেন, সে সম্বন্ধে মতপ্রকাশের আগ্রহে আমরা আত্মসম্ভ্রমের মর্যাদা লঙ্ঘন করিব কেন। সমস্ত দেশের মাথার উপরকার আকাশে যখন একটা রুদ্ররোষ রক্তবর্ণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে তখন সেই বজ্রধরের সম্মুখে আমাদের দায়িত্ববিহীন চাপল্য কেবল যে অনাবশ্যক তাহা নহে তাহা কেমন-এক-প্রকার অসংগত।

যিনি নিজেকে যতই দূরদর্শী বলিয়া মনে করুন-না, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঘটনা যে এতদূর আসিয়া পৌঁছিতে পারে তাহা দেশের অধিকাংশ লোক কল্পনা করে নাই। বুদ্ধি আমাদের সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে, কিন্তু চোর পালাইলে সেই বুদ্ধির যতটা বিকাশ হয় পূর্বে ততটা প্রত্যাশা করা যায় না।

অবশ্য, ঘটনা যখন ঘটিয়াছে তখন এ কথা বলা সহজ যে, ঘটনার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই ঘটিয়াছে। এবং অমনি এই সুযোগে আমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বভাবত কিছু অধিক উত্তেজনাশীল তাঁহাদিগকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলা সহজ যে, তোমরা যদি এতটা-দূর বাড়াবাড়ি না করিতে তবে ভালো হইত।

আমরা হিন্দু, বিশেষত বাঙালি, বাক্যে যতই উত্তেজনা প্রকাশ করি, কোনো দুঃসাহসিক কাজে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারি না, এই লজ্জার কথা দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইতে বাকি নাই। ইহা লইয়া বাবুসম্প্রদায় বিশেষভাবে ইংরেজের কাছে অহরহ দুঃসহ ভাষায় খোঁটা খাইয়া আসিয়াছে। সর্বপ্রকার উত্তেজনাবাক্য অন্তত বাংলাদেশে যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এ সম্বন্ধে আমাদের শত্রুমিত্র কাহারো কোনো সন্দেহমাত্র ছিল না। তাই এ-পর্যন্ত কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গিতে আমরা যতই বাড়াবাড়ি প্রকাশ করিয়াছি তাহা দেখিয়া কখনো-বা পর কখনো-বা আত্মীয় বিরক্ত হইয়াছে, রাগ করিয়াছে, আমাদের

অসংযমকে প্রহসন বলিয়া উপহাস করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। বস্তুত বাংলা কাগজে অথবা কোনো বাঙালি বক্তার মুখে যখন অপরিমিত স্পর্ধাবাক্য বাহির হইত তখন এই বলিয়াই বিশেষভাবে স্বজাতির জন্য লজ্জা অনুভব করিয়াছি যে, যাহারা দুঃসাহসিক কাজ করিবার জন্য বিখ্যাত নহে তাহাদের বাক্যের তেজ দীনতাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করে মাত্র। বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালিজাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায়-অন্যায় ইষ্ট-অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান-মোচনের উপলক্ষে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।

অতএব এ কথাটা সত্য যে, বাংলাদেশের মনে জ্বালা দেখিতে দেখিতে ক্রমশই যে-প্রকার অগ্নিমূর্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে ইহাকে আমাদের দেশের বা অন্য দেশের কোনো জ্ঞানী পুরুষ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কোনোদিন অনুমান করেন নাই। অতএব আজ আমাদের এই অকস্মাৎ-বুদ্ধিবিকাশের দিনে যাহাকে আমার ভালো লাগে না তাহাকে ধরিয়া অসাবধানতার জন্য দায়ী করিতে বসা সুবিচারসংগত নহে। আমিও এই গোলমালের দিনে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করিতে চাই না। কিন্তু কেমন করিয়া কী ঘটিল এবং তাহার ফলাফলটা কী, সেটা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া আমাদের পথ ঠিক করিয়া লইতেই হইবে; সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি একজনের বা অনেকের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য প্রকাশ হয় তবে দয়া করিয়া এ কথা নিশ্চয় মনে রাখিবেন যে, আমার বুদ্ধির ক্ষীণতা থাকিতে পারে, আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা থাকা সম্ভব, কিন্তু স্বদেশের হিতের প্রতি ঔদাসীন্য বা হিতৈষীদের প্রতি কিছুমাত্র বিরুদ্ধভাববশত যে আমি বিচারে ভুল করিতেছি ইহা কদাচ সত্য নহে। অতএব আমার কথাগুলি যদি-বা গ্রাহ্য না'ও করেন, আমার অভিপ্রায়ের প্রতি ধৈর্য ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিবেন।

বাংলাদেশে কিছুকাল হইতে যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহার সংঘটনে আমাদের কোন্ বাঙালির কতটা অংশ আছে তাহার সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া এ কথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা মন বা বাক্যে ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো প্রকারে খাদ্য জোগাইয়াছি। অতএব যে চিত্তদাহ কেবল পরিমিত স্থান লইয়া বদ্ধ থাকে নাই, প্রকৃতিভেদে যাহার উত্তেজনা আমরা প্রত্যেকে নানাপ্রকারে অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছি, তাহারই একটা কেন্দ্রক্ষিপ্ত পরিণাম যদি এইপ্রকার গুপ্ত বিপ্লবের অদ্ভুত আয়োজন হয় তবে ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। জ্বর যখন সমস্ত শরীরকে অধিকার করিয়াই হইয়াছিল তখন হাতের তেলো, কপালের চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল বলিয়াই মৃত্যুকালে নিজেকে সাধু ও কপালটাকেই যত নষ্টের গোড়া বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবে না। আমরা কী করিব, কী করিতে চাই, সে কথা স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; এই জানি আমাদের মনে আগুন জ্বলিয়াছিল। সেই আগুন স্বভাবধর্মবশত ছড়াইয়া পড়িতেই ভিজা কাঠ ধোঁয়াইতে থাকিল, শুকনা কাঠ জ্বলিতে লাগিল এবং ঘরের কোণে কোন্খানে কেরোসিন ছিল সে আপনাকে ধারণ করিতে না পারিয়া টিনের শাসন বিদীর্ণ করিয়া একটা বিভীষিকা করিয়া তুলিল।

তা যাই হোক,কার্যকারণের পরস্পরের যোগে পরস্পরের ব্যাপ্তি যেমন করিয়াই ঘটুক-না কেন, তাই বলিয়া অগ্নি যখন অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলে তখন সব তর্ক ছাড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ হইলে চলিবে না।

বিশেষত কারণটা দেশ হইতে দূর হয় নাই; লোকের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া আছে। উত্তেজনা এতই তীব্র যে, যে-সকল সাংঘাতিক ব্যাপার আমাদের দেশে অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইত তাহাও সম্ভবপর হইয়াছে। বিরোধবুদ্ধি এতই গভীর এবং সুদূরবিস্তৃত ভাবে ব্যাপ্ত যে, কর্তৃপক্ষ ইহাকে বলপূর্বক

কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিয়া কখনোই নিঃশেষ করিতে পারিবেন না, বরঞ্চ ইহাকে আরো প্রবল ও প্রকাণ্ড করিয়া তুলিবেন।

বর্তমান সংকটে রাজপুরুষদের কী করা কর্তব্য তাহা আলোচনা করিতে গেলে তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়া শুনিবেন বলিয়া ভরসা হয় না। আমরা তাঁহাদের দণ্ডশালার দ্বারে বসিয়া তাঁহাদিগকে পোলিটিকাল প্রাজ্ঞতা শিক্ষা দিবার দুরাশা রাখি না। আমাদের বলিবার কথাও অতি পুরাতন এবং শুনিলে মনে হইবে, ভয়ে বলিতেছি। তবু সত্য পুরাতন হইলেও সত্য এবং তাহাকে ভুল বুঝিলেও তাহা সত্য। কথাটি এই– শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; কথা আরো একটু আছে, ক্ষমা শুধু শক্তের ভূষণ নহে, সময়বিশেষে শক্তের ব্রহ্মাস্ত্রও ক্ষমা। কিন্তু আমরা যখন শক্তের দলে নহি তখন এই সাত্ত্বিক উপদেশটি লইয়া অধিক আলোচনা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না।

ব্যাপারটা দুই পক্ষকে লইয়া– অথচ দুই পক্ষের মধ্যে আপসে বোঝাপড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এক দিকে প্রজার বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া বল একান্ত প্রবল মূর্তি ধরিতেছে, অন্য দিকে দুর্বলের নিরাশ মনোরথ সফলতার কোনো পথ না পাইয়া প্রতিদিন মরিয়া হইয়া উঠিতেছে; এ অবস্থায় সমস্যাটি ছোটো নহে। কারণ, আমরা এই দুই পক্ষের ব্যাপারে কেবল এক পক্ষকে লইয়া যেটুকু চেষ্টা করিতে পারি তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ঝড়ের দিনে হালের মাঝি নিজের খেয়ালে চলিতেছে; আমরা দাঁড় দিয়া যেটুকু রক্ষা করিতে পারি অগত্যা তাহাই করিতে হইবে– মাঝি সহায় যদি হয় তবে ভালোই, যদি না'ও হয় তবু দুঃসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কারণ, যখন ডুবিতে বসিব তখন অন্যকে গালি পাড়িয়া কোনো সান্ত্বনা পাইব না।

এইরূপ দুঃসময়ে সত্যকে চাপাচুপি দিতে যাওয়া প্রলয়ক্ষেত্রে বসিয়া ছেলেখেলা করা মাত্র। আমরা গবর্মেন্টকে বলিবার চেষ্টা করিতেছি- এ-সমস্ত কিছুই নয়, এ কেবল দুই-পাঁচজন ছেলেমানুষের চিত্তবিকারের পরিচয়। আমি তো এ- প্রকার শূন্যগর্ভ সান্ত্বনাবাক্যের কোনোই সার্থকতা দেখি না। প্রথমত, এরূপ ফুৎকারবায়ুমাত্রে আমরা গবর্মেন্টের পলিসির পালকে এক ইঞ্চিও ফিরাইতে পারিব না। দ্বিতীয়ত, দেশের বর্তমান অবস্থায় কোথায় কী হইতেছে তাহা নিশ্চয় জানি বলিলে যে মিথ্যা বলা হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে। অতএব বিপদের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াই আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দায়িত্ববোধহীন লঘু বাক্যের দ্বারা কোনো সত্যকার সংকটকে ঠেকনো যায় না- এখন কেবল সত্যের প্রয়োজন।

এখন আমাদের দেশের লোককে অকপট হিতৈষণা হইতে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে, গবর্মেন্টের শাসননীতি যে পন্থাই অবলম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনই মথিত করিতে থাক্, আমাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।

যে কাল পড়িয়াছে এখন ধর্মের দোহাই দেওয়া মিথ্যা। কারণ রাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম-নীতির স্থান আছে এ কথা যে ব্যক্তি সম্পূর্ণবিশ্বাসে প্রকাশ করে, লোকে তাহাকে হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় নীতিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। প্রয়োজনের সময় প্রবল পক্ষ ধর্মকে মান্য করা কার্যহন্তারক দীনতা বলিয়া মনে করে, পশ্চিম-মহাদেশের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে; তৎসত্ত্বেও প্রয়োজনসাধনের উপলক্ষে যদি দুর্বলকে ধর্ম মানিতে উপদেশ দিই তবে উত্তেজনার অবস্থায় তাহারা উত্তর দেয়- এ তো ধর্ম মানা নয়, এ ভয়কে মানা।

অল্পদিন হইল যে বোয়ার-যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে জয়লক্ষ্মী যে ধর্মবুদ্ধির পিছন পিছন চলেন নাই সে কথা কোনো কোনো ধর্মভীরু ইংরেজের মুখ হইতেই শুনা গিয়াছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের মনে ভয় উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য তাহাদের গ্রাম-পল্লী উৎসাদিত করিয়া, ঘরদুয়ার জ্বালাইয়া, খাদ্যদ্রব্য লুটপাট করিয়া, নির্বিচারে বহুতর নিরপরাধ নরনারীকে নিরাশ্রয় করিয়া দেওয়া যুদ্ধ-ব্যাপারের একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। “মার্শাল ল’ শব্দের অর্থই প্রয়োজনকালে ন্যায়বিচারের বুদ্ধিকে একটা পরম বিঘ্ন বলিয়া নির্বাসিত করিয়া দিবার বিধি এবং তদুপলক্ষে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানব-প্রকৃতির বাধামুক্ত পাশবিকতাকেই প্রয়োজনসাধনের সর্বপ্রধান সহায় বলিয়া ঘোষণা করা। প্যুনিটিভ পুলিসের দ্বারা সমস্ত নিরুপায় গ্রামের লোককে বলপূর্বক ভারাক্রান্ত করিবার নির্বিবেক বর্বরতাও এইজাতীয়। এই-সকল বিধির দ্বারা প্রচার করা হয় যে, রাষ্ট্রকার্যে বিশুদ্ধ ন্যায়ধর্ম প্রয়োজনসাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে।

য়ুরোপের এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন অবস্থায় যখন বিশেষ ঘটনায় বিশেষ কারণে কোনো অধীন জাতি সহসা নিজেদের অধীনতার ঐকান্তিক মূর্তি দেখিয়া সর্বান্তঃকরণে পীড়িত হইয়া উঠে, অথচ নিজেদের সর্বপ্রকার নিরুপায়তার অপমানে উত্তপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে একদল অধীর অসহিষ্ণু ব্যক্তি যখন গোপন পন্থা অবলম্বন করিয়া কেবল ধর্মবুদ্ধিকে নহে কর্মবুদ্ধিকেও বিসর্জন দেয়, তখন দেশের আন্দোলনকারী বক্তাদিগকেই এইজন্য দায়ী করা বলদর্পে-অন্ধ গায়ের জোরের মূঢ়তা মাত্র।

অতএব দেশের যে-সকল লোক গুপ্তপন্থাকেই রাষ্ট্রহিতসাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোনো ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে।

আমরা যে যুগে বর্তমান এ যুগে ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্যভাবে কুণ্ঠিত তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতার যে দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্বল, ধনী ও শ্রমী কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। রাজাও প্রয়োজনের জন্য প্রজাকে দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিবে এবং প্রজাও প্রয়োজনের জন্য রাজাকেও দুর্নীতির দ্বারাই আঘাত করিতে চেষ্টা করিবে, এবং যে-সকল তৃতীয় পক্ষের লোক এই-সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নহে তাহাদিগকেও এই অধর্মসংঘর্ষের অগ্নিদাহ সহ্য করিতে হইবে। বস্তুত, সংকটে পড়িয়া মানুষ যেদিন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, অধর্মকে বেতন দিতে গেলে সে যে কেবল এক পক্ষেরই বাঁধা গোলামি করে তাহা নহে, সে দুই পক্ষেরই নিমক খাইয়া যখন সকল পক্ষেই সমান ভয়ংকর হইয়া উঠে, তখন তাহার সহায়তাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে একযোগে নির্বাসিত করিয়া দিবার জন্য বিপন্ন সমাজে পরস্পরের মধ্যে রফা চলিতে থাকে। এমনি করিয়াই ধর্মরাজ নিদারুণ সংঘাতের মধ্য হইতেই ধর্মকে জয়ী করিয়া উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। যতদিন তাহা সম্পূর্ণ না হয় ততদিন সন্দেহের সঙ্গে সন্দেহের, বিদ্বেষের সঙ্গে বিদ্বেষের এবং কপটনীতির সহিত কপটনীতির সংগ্রামে সমস্ত মানবসমাজ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে।

অতএব বর্তমান অবস্থায় যদি উত্তেজিত দেশের লোককে কোনো কথা বলিতে হয় তবে তাহা প্রয়োজনের দিক হইতেই বলিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কথা ভালো করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়- কোনো সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপে করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না, কাজও নষ্ট হইবে। আমার মনের তাগিদ অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনোদিন রাস্তাও নিজেকে ছাঁটিয়া দেয় না, সময়ও নিজেকে খাটো করে না।

দেশের হিতানুষ্ঠান জিনিসটা যে কতই বড়ো এবং কতদিকেই যে তাহার অগণ্য শাখাপ্রশাখা প্রসারিত সে কথা আমরা যেন কোনো সাময়িক আক্ষেপে ভুলিয়া না যাই। ভারতবর্ষের মতো নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধ-গ্রস্ত দেশে তাহার সমস্যা নিতান্তই দুরূহ। ঈশ্বর আমাদের উপর এমন-একটি সুমহৎ কর্মের ভার দিয়াছেন, আমরা মানবসমাজের এতবড়ো একটা প্রকাণ্ড জটিল জালের শতসহস্র গ্রন্থিচ্ছেদনের আদেশ লইয়া আসিয়াছি যে, তাহার মাহাত্ম্য যেন একমুহূর্তও বিস্মৃত হইয়া আমরা কোনোপ্রকার চাপল্য প্রকাশ না করি। আদিকাল হইতে জগতে যতগুলি বড়ো বড়ো শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকলগুলিরই কোনো-না- কোনো বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক স্মৃতির অতীতকালে কোন্‌ নিগূঢ় প্রয়োজনের দুর্নিবার তাড়নায় যেদিন আর্যজাতি গিরিগুহামুক্ত স্রোতস্বিনীর মতো অকস্মাৎ সচল হইয়া বিশ্বপথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদেরই এক শাখা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষের অরণ্যচ্ছায়ায় যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, সেইদিন ভারতবর্ষের আর্য-অনার্য-সম্মিলনক্ষেত্রে যে বিপুল ইতিহাসের উপক্রমণিকাগান আরম্ভ হইয়াছিল আজ কি তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছে। বিধাতা কি তাহা শিশুর ধুলাঘর-নির্মাণের মতোই আজ হঠাৎ অনাদরে ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পরে এই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের মিলনমন্ত্র করুণাজলভার-গম্ভীর মেঘমন্দ্রের মতো ধ্বনিত হইয়া এশিয়ার পূর্বসাগরতীরবাসী সমস্ত মঙ্গোলীয় জাতিদিগকে জাগ্রত করিয়া দিল এবং ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিদূর জাপান পর্যন্ত ভিন্নভাষী অনাত্মীয়দিগকে ধর্ম সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্মা করিয়া দিয়াছে, ভারতক্ষেত্রে সেই মহৎ শক্তির অভ্যুদয় কি কেবল ভারতের ভাগ্যেই পরিণামহীন পণ্ডতাতেই পর্যবসিত হইয়াছে। তাহার পরে এশিয়ার পশ্চিমতম প্রান্তে দৈববলে প্রেরণায় মানবের আর- এক মহাশক্তি সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া ঐক্যমন্ত্র বহন করিয়া দারুণবেগে পৃথিবী প্লাবিত করিতে বাহির হইল; সেই শক্তিস্রোতকে বিধাতা যে কেবল ভারতবর্ষে আহ্বান

করিয়াছেন তাহা নহে, এইখানেই তিনি তাহাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিয়াছেন। আমাদের ইতিহাসে এই ব্যাপার কি কোনো-একটা আকস্মিক উৎপাত মাত্র। ইহার মধ্যে নিত্যসত্যের কোনো চিরপরিচয় নাই? তাহার পরে য়ুরোপের মহাক্ষেত্রে মানবশক্তি প্রাণের প্রাবল্যে, বিজ্ঞানের কৌতূহলে, পণ্যসংগ্রহের আকাঙক্ষায় যখন বিশ্বাভিমুখী হইয়া বাহির হইল তখন তাহারও একটি বৃহৎ প্রবল ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়াই বিধাতার আহ্বান বহন করিয়া আমাদিগকে আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। এই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন অপসারিত হইয়া গেলে পর যখন খণ্ড খণ্ড দেশের খণ্ড খণ্ড ধর্মসম্প্রদায় বিরোধবিচ্ছিন্নতায় চতুর্দিককে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছিল তখন শংকরাচার্য সেই-সমস্ত খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতাকে একমাত্র অখণ্ড বৃহত্ত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে দার্শনিক-জ্ঞান প্রধান সাধনা যখন ভারতবর্ষের জ্ঞানী-অজ্ঞানী অধিকারী-অনধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল তখন চৈতন্য নানক দাদু কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্মগুলির বিচ্ছেদক্ষত প্রেমের দ্বারা মিলাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান-প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনই যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে- রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতীতকাল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই এক-একটি অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপমাত্র নহে- ইহারা পরস্পর গ্রথিত, ইহারা কেহই একেবারে স্বপ্নের মতো অন্তর্ধান করে নাই- ইহারা সকলেই রহিয়াছে, ইহারা সন্ধিতেই হউক, সংগ্রামেই হউক, ঘাতপ্রতিঘাতে বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব বিচিত্ররূপে সংরচিত

করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর-কোনো দেশেই এতবড়ো বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই; এত জাতি এত ধর্ম এত শক্তি কোনো তীর্থস্থলেই একত্র হয় নাই; একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর-কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। আর সর্বত্র মানুষ রাজ্য বিস্তার করুক, পণ্য বিস্তার করুক, প্রতাপ বিস্তার করুক- ভারতবর্ষের মানুষ দুঃসহ তপস্যা দ্বারা এককে ব্রহ্মকে জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্মশালার কঠোর সংকীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া দিক- ভারত-ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খৃস্টান, পূর্ব ও পশ্চিম, কেহ আমাদের বিরুদ্ধ নহে- ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতি কঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই অতি সুদূরকালে এখানকার তপোবনে একের তত্ত্ব উপনিষদ এমন আশ্চর্য সরল জ্ঞানের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন যে, ইতিহাস তাহাকে নানা দিক দিয়া ব্যাখ্যা করিতে করিতে আজও অন্ত পায় নাই।

তাই আমি অনুরোধ করিতেছিলাম, অন্যান্য দেশে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সংকীর্ণ করিয়া দেখিবেন না- ইহার মধ্যে যে বহুতর আপাতবিরোধ লক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিয়া হতাশ হইয়া কোনো ক্ষুদ্র চেষ্টায় নিজেকে অন্ধভাবে নিযুক্ত করিবেন না- করিলেও, কোনোমতেই কৃতকার্য হইবেন না এ কথা নিশ্চয় জানিবেন। বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়; তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্যসিদ্ধি আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া ভয়ংকর ব্যর্থতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে।

যে ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎশক্তিপুঞ্জ দ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপে বিরাটমূর্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, সমস্ত আঘাত-অপমান সমস্ত বেদনা যাহাকে এই পরম-প্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহাভারতবর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতনভাবে কে করিবেন, কে একান্ত অবিচলিত ভক্তির সহিত সমস্ত ক্ষোভ-অধৈর্য-অহংকারকে এই মহাসাধনায় বিলীন করিয়া দিয়া ভারতবিধাতার পদতলে নিজের নির্মল জীবনকে পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় নিবেদন করিয়া দিবেন। ভারতের মহাজাতীয়-উদ্‌বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দ কোথায়। তাঁহারা যেখানেই থাকুন, এ কথা আপনারা ধ্রুবসত্য বলিয়া জানিবেন, তাঁহারা চঞ্চল নহেন, তাঁহারা উন্মত্ত নহেন, তাঁহারা কর্মনির্দেশশূন্য স্পর্ধাবাক্যের দ্বারা দেশের লোকের হৃদয়াবেগকে উত্তরোত্তর সংক্রামক বায়ুরোগে পরিণত করিতেছেন না; নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয় এবং কর্মনিষ্ঠার অতি অসামান্য সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানের সুগভীর শান্তি ও ধৈর্য এবং ইচ্ছাশক্তির অপরাজিত বেগ ও অধ্যবসায় এই উভয়ের সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে।

কিন্তু যখন দেখা যায়, কোনো-একটা বিশেষঘটনামূলক উত্তেজনার তাড়নায়, একটা সাময়িক বিরোধের ক্ষুব্ধতায় দেশের অনেক লোক সহসা দেশের হিত করিতে হইবে বলিয়া একমুহূর্তে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হয়- নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, হৃদয়াবেগকে একমাত্র সম্বল করিয়া তাহারা দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা দেশের সুদূর ও সুবিস্তীর্ণ মঙ্গলকে শান্তভাবে সত্যভাবে বিচার করিতে অবস্থাগতিকেই অক্ষম। তাহারা তাহাদের উপস্থিত বেদনাকেই এত তীব্রভাবে অনুভব করে এবং তাহারই প্রতিকারচেষ্টাকে এত উগ্রভাবে মনে রাখে যে, আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়া দেশের সমগ্র হিতকে আঘাত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।

ইতিবৃত্তের শিক্ষাকে ঠিকমত বিচার করিয়া লওয়া বড়ো কঠিন। সকল দেশের ইতিহাসেই কোনো বৃহৎ ঘটনা যখন মূর্তিগ্রহণ করিয়া দেখা দেয় তখন তাহার অব্যবহিত পূর্বেই আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন দেখিতে পাই। রাষ্ট্রে বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে, তবেই সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে কাটাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে। দেশের সেই আভ্যন্তরিক প্রাণসম্বল যাহা অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্নভাবে উপচিত হয় তাহা আম্রা দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা মনে করি, বুঝি বিপ্লবের দ্বারাতেই দেশ সার্থকতা লাভ করিল; বিপ্লবই যেন মঙ্গলের মূল কারণ এবং মুখ্য উপায়।

ইতিহাসকে এইরূপে বাহ্যভাবে দেখিয়া এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যে দেশের মর্মস্থানে সৃষ্টি করিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, প্রলয়ের আঘাতকে সে কখনোই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্মকেই, তাহাদের সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।

পালে খুব দমকা হাওয়া লাগিতেই যে- জাহাজ জড়ত্ব দূর করিয়া হুহু করিয়া চলিয়া গেল, নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আর-কিছু না হউক সে জাহাজের খোলের তক্তাগুলার মধ্যে ফাঁক ছিল না, যদি-বা পূর্বে ছিল এমন হয়, তবে নিশ্চয়ই কোনো-এক সময়ে জাহাজের মিস্ত্রি খোলের অন্ধকারে অলক্ষ্যে

সূচিপত্র

বসিয়া সেগুলা সারিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে জীর্ণ জাহাজকে একটু নাড়া দিলেই তাহার একটা আলগা তক্তার উপরে আর-একটা আলগা তক্তা ঠক্ ঠক্ করিয়া আঘাত করিতে থাকে, ওই দমকা হাওয়া কি তাহার পালের পক্ষে সর্বনেশে জিনিস নয়। আমাদের দেশেও একটুমাত্র নাড়া খাইলেই হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে সংঘাত বাধিয়া যায় না কি। ভিতরে যখন এমন-সব ফাঁক তখন ঝড় কাটাইয়া, ঢেউ বাঁচাইয়া, স্বরাজের বন্দরে পৌঁছিবার জন্য কি কেবল উত্তেজনাকে উন্মাদনায় পরিণত করাই পরিত্রাণের প্রশস্ত উপায়।

বাহির হইতে দেশ যখন অপমান লাভ করে, যখন আমাদের অধিকারকে বিস্তীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেই কর্তৃপক্ষদের নিকট হইতে অযোগ্যতার অপবাদ প্রাপ্ত হইতে থাকি, তখন আমাদের দেশের কোনো দুর্বলতা কোনো ত্রুটি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। তখন যে আমরা কেবল পরের কাছে মুখরক্ষা করিবার জন্যই গরিমা প্রকাশ করি তাহা নহে, আহত অভিমানে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিও অন্ধ হইয়া যায়; আমরা যে অবজ্ঞার যোগ্য নহি তাহা চক্ষের পলকেই প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য আমরা একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠি। আমরা সবই পারি, আমাদের সমস্তই প্রস্তুত, শুদ্ধমাত্র বাহিরের বাধাতেই আমাদিগকে অক্ষম করিয়া রাখিয়াছে এই কথাই কেবল অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিবার চেষ্টা হয় তাহা নহে, এইরূপ বিশ্বাসে কাজে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের লাঞ্ছিত হৃদয় উদ্দাম হইয়া উঠে। এইপ্রকারে অত্যন্ত চিত্তক্ষোভের সময়েই ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে-সকল অধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখার জন্য আর-কোনো গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতেই চাহি না অথবা তাড়াতাড়ি করিয়া মনে করি, সে-সমস্ত গুণ আমাদের আছে, কিম্বা উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেগুলি আপনিই কোনোরকম করিয়া জোগাইয়া যাইবে।

এইরূপে মানুষের চিত্ত যখন অপমানে আহত হইয়া নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত কঠিন বাধাকে উন্মত্তের মতো একেবারে অস্বীকার করিয়া অসাধ্য চেষ্টায় আত্মহত্যা করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, তখন তাহার মতো মর্মান্তিক করুণাবহ ব্যাপার জগতে আর কী আছে। এইপ্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবেই, তথাপি ইহাকে আমরা পরিহাস করিতে পারিব না। ইহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির যে পরমদুঃখকর অধ্যবসায় আছে তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বকালেই নানা উপলক্ষে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্যসাধনে বারম্বার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় নিশ্চিত পরাভবের বহ্নিশিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।

যাই হোক, যেমন করিয়াই হোক, শক্তির অভিমান আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিলে সেটা জাতির পক্ষে যে অনিষ্টকর তাহা বলা যায় না। তবে কিনা বিরোধের ক্রুদ্ধ আবেগের দ্বারা আমাদের এই উদ্যম হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশের শক্তিকে বিরোধের মূর্তিতেই প্রকাশ করিবার দুর্বুদ্ধি অন্তরে পোষণ করিতেছেন। কিন্তু যাহারা সহজ অবস্থায় কোনোদিন স্বাভাবিক অনুরাগের দ্বারা দেশের হিতানুষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হয় নাই, যাহারা উচ্চ সংকল্পকে বহুদিনের ধৈর্যে নানা উপকরণে নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে নিজের প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে নাই, অনেকদিন ধরিয়া রাষ্ট্রচালনার বৃহৎ কার্যক্ষেত্র হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুসরণে সংকীর্ণভাবে জীবনের কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা হঠাৎ বিষম রাগ করিয়া এক নিমেষে দেশের একটা মস্ত হিত করিয়া ফেলিবে ইহা কোনোমতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। ঠাণ্ডার দিনে নৌকার কাছেও ঘেঁষিলাম না, তুফানের দিনে তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া অসামান্য মাঝি বলিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইব এইরূপ আশ্চর্য ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব। অতএব আমাদিগকেও কাজ

একেবারে সেই গোড়ার দিক হইতেই শুরু করিতে হইবে। তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে- বিপরীত উপায়ে আরও অনেক বেশি বিলম্ব হইবে।

মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যা দ্বারা। ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে, এবং তপস্যার ফলকে একমুহূর্তে নষ্ট করিয়া দেয়। নিশ্চয়ই আমাদের দেশও কল্যাণময় চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করিতেছে; দ্রুত ফললাভের লোভ তাহার নাই, সাময়িক আশাভঙ্গের ক্রোধকে সে সংযত করিয়াছে; এমন সময় আজ অকস্মাৎ ধৈর্যহীন উন্মত্ততা যজ্ঞক্ষেত্রে রক্তবৃষ্টি করিয়া তাহার বহুদুঃখসঞ্চিত তপস্যার ফলকে কলুষিত করিয়া নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।

ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না। তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনাকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া- পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে পাকিতে দেওয়াকেই সে ঔদাসীন্য বলিয়া জ্ঞান করে, টান দিয়া ফলকে ছিঁড়িয়া লওয়াকেই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে; সে মনে করে, যে মালী প্রতিদিন গাছের তলায় জল সেচন করিতেছে গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা। এ অবস্থায় মালীর উপর তাহার রাগ হয়, জল দেওয়াকে সে ছোটো কাজ মনে করে। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ উত্তেজনাকেই জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য বলিয়া জানে; যেখানে তাহার অভাব দেখে, সেখানে সে কোনো সার্থকতাই দেখিতে পায় না।

কিন্তু স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ। চকমকি ঠুকিয়া যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। তাহার আয়োজন স্বল্প, তেমনি তাহার প্রয়োজনও

সামান্য। প্রদীপের আয়োজন অনেক; তাহার আধার গড়িতে হয়, সলিতা পাকাইতে হয়, তাহার তেল জোগাইতে হয়। যখন যথাযথ মূল্য দিয়া সমস্ত কেনা হইয়াছে এবং পরিশ্রম করিয়া সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে তখনই প্রয়োজন হইলে স্ফুলিঙ্গ প্রদীপের মুখে আপনাকে স্থায়ী শিখায় পরিণত করিয়া ঘরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। যখন উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারা সেই প্রদীপ-রচনার আয়োজন করিবার উদ্যম জাগিতেছে না, যখন শুদ্ধমাত্র ঘন ঘন চকমকি ঠোকার চাঞ্চল্যমাত্রেই সকলে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিতেছি, তখন সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে, এমন করিয়া কখনোই ঘরে আলো জ্বলিবে না, কিন্তু ঘরে আগুন লাগা অসম্ভব নহে।

কিন্তু শক্তিকে সুলভ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় মানুষ উত্তেজনার আশ্রয় অবলম্বন করে। এ কথা ভুলিয়া যায় যে, এই অস্বাভাবিক সুলভতা এক দিকে মূল্য কমাইয়া আর-এক দিক দিয়া এমন করিয়া মূল্য আদায় করিয়া লয় যে, গোড়াতেই তাহার দুর্মূল্যতা স্বীকার করিয়া লইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশেও যখন দেশের হিতসাধন-বুদ্ধি-নামক দুর্লভ মহামূল্য পদার্থ একটি আকস্মিক উত্তেজনায় আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে অভাবনীয় প্রচুররূপে দেখা দিল তখন আমাদের মতো দরিদ্র জাতিকে পরমানন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তখন এ কথা আমাদের মনে করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই যে, ভালো জিনিসের এত সুলভতা স্বাভাবিক নহে। এই ব্যাপক পদার্থকে কাজের শাসনের মধ্যে বাঁধিয়া সংযত সংহত করিতে না পারিলে ইহার প্রকৃত সার্থকতাই থাকে না। রাস্তাঘাটের লোক যুদ্ধ করিব বলিয়া মাতিয়া উঠিলেই তাহাদিগকে সৈন্য জ্ঞান করিয়া যদি সুলভে কাজ সারিবার আশ্বাসে উল্লাস করিতে থাকি তবে সত্যকার লড়াইয়ের বেলায় সমস্ত ধনপ্রাণ দিয়াও এই হঠাৎ-সস্তার সাংঘাতিক দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

আসল কথা, মাতাল যেমন নিজের এবং মণ্ডলীর মধ্যে নেশাকে কেবলই বাড়াইয়া চলিতেই চায়, তেমনি উত্তেজনার মাদকতা আমরা সম্প্রতি যখন অনুভব করিলাম তখন কেবলই সেটাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া উঠিল। অথচ এটা যে একটা নেশার তাড়না সে কথা স্বীকার না করিয়া আমরা বলিতে লাগিলাম, গোড়ায় ভাবের উত্তেজনারই দরকার বেশি, সেটা রীতিমতো পাকিয়া উঠিলে আপনিই তাহা কাজের দিকে ধাবিত হয়- অতএব দিনরাত যাহারা কাজ কাজ করিয়া বিরক্ত করিতেছে তাহারা ছোটো নজরের লোক, তাহারা ভাবুক নহে- আমরা কেবলই ভাবে দেশ মাতাইব। সমস্ত দেশ জুড়িয়া আমরা ভাবের ভৈরবীচক্র বসাইয়া দিলাম; মন্ত্র এই হইল-

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে

উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্মো ন বিদ্যতে।

চেষ্টা নহে, কর্ম নহে, কিছুই গড়িয়া তোলা নহে- কেবল ভাবোচ্ছ্বাসই সাধনা, মত্ততাই মুক্তি।

অনেককেই আহ্বান করিলাম, অনেককেই সমবেত করিলাম, জনতার বিস্তার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, কিন্তু এমন করিয়া কোনো কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম না যাহাতে উদ্‌বোধিত শক্তিকে সকলে সার্থক করিতে পারে। কেবল উৎসাহই দিতে লাগিলাম, কাজ দিলাম না। মানুষের মনের পক্ষে এমন অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার আর কিছুই নাই। মনে করিলাম উৎসাহে মানুষকে নির্ভীক করে এবং নির্ভীক হইলে মানুষ কর্মের বাধাবিপত্তিকে লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এইরূপ লঙ্ঘন করিবার উত্তেজনাই তো কর্মসাধনের সর্বপ্রধান অঙ্গ নহে- স্থিরবুদ্ধি লইয়া বিচারের শক্তি, সংযত হইয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি

যে তাহার চেয়ে বড়ো। এইজন্যই মাতাল হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে, কিন্তু মাতাল হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না। যুদ্ধের মধ্যে কিছু পরিমাণ মত্ততা নাই তাহা নহে; কিন্তু অপ্রমত্ততাই প্রভু হইয়া তাহাকে চালিত করে। সেই স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী কর্মোৎসাহী প্রভুকে বর্তমান উত্তেজনার দিনে দেশ খুঁজিয়াছে, আহ্বান করিয়াছে; ভাগ্যহীন দেশের দৈন্যবশত তাঁহার তো সাড়া পাওয়া যায় না। আমরা যাহারা ছুটিয়া আসি কেবল মদের পাত্রে মদই ঢালি। এঞ্জিনে স্টীমের দমই বাড়াইতে থাকি। যখন প্রশ্ন ওঠে, পথ সমান করিয়া রেল বসাইবার আয়োজন কে করিবে, তখন আমরা উত্তর করি, এ-সমস্ত নিতান্ত খুচরা কাজের হিসাব লইয়া মাথা বকাইবার প্রয়োজন নাই; সময়কালে আপনিই সমস্ত হইয়া যাইবে, মজুরদের কাজ মজুররাই করিবে, কিন্তু আমরা যখন চালক তখন আমরা কেবল এঞ্জিনে দমই চড়াইতে থাকিব।

এ পর্যন্ত যাঁহারা সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা হয়তো আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনার উদ্রেক হইয়াছে তাহা হইতে কোনো শুভ ফল প্রত্যাশা করিবার নাই।

নাই, এমন কথা আমি কখনোই মনে করি না। অসাড় শক্তিকে সচেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার পরে কী করিতে হইবে। কাজ করাইতে হইবে, না মাতাল করিতেই হইবে? যে পরিমাণ মদে ক্ষীণ প্রাণকে কাজের উপযোগী করিয়া তোলে তাহার চেয়ে বেশি মদে পুনশ্চ তাহার কাজের উপযোগিতা নষ্ট করিয়া দেয়; যে-সকল সত্যকর্মে ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে কাজে মাতালের শক্তি এবং অভিরুচি বিমুখ হইয়া উঠে। ক্রমে উত্তেজনাই তাহার লক্ষ্য হয় এবং সে দায়ে পড়িয়া কাজের নামে এমন-সকল অকাজের সৃষ্টি করিতে থাকে যাহা তাহার মত্ততারই আনুকূল্য করিতে পারে। এই-সকল

উৎপাত-ব্যাপারকে বস্তুত তাহারা মাদকস্বরূপেই ব্যবহার করে, অথচ তাহাকে স্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চসুরেই বাঁধিয়া রাখে। “হৃদয়াবেগ’ জিনিসটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহির্মুখ না হইয়া যখন কেবলই অন্তরে সঞ্চিত ও বর্ধিত হইতে থাকে তখন তাহা বিষের মতো কাজ করে; তাহার অপ্রয়োজনীয় উদ্যম আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া কর্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।

ঘুম হইতে জাগিয়া নিজের সচল শক্তিকে সত্য বলিয়া জানিবার জন্য প্রথম যে-একটা উত্তেজনার আঘাত আবশ্যক তাহাতে আমাদের প্রয়োজন ছিল। মনে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম, ইংরেজ জন্মান্তরের সুকৃতি এবং জন্মকালের শুভগ্রহস্বরূপ আমাদের কর্মহীন জোড়করপুটে আমাদের সমস্ত মঙ্গল আপনি তুলিয়া দিবে। বিধাতা-নির্দিষ্ট আমাদের সেই বিনা চেষ্টার সৌভাগ্যকে কখনো-বা বন্দনা করিতাম, কখনো-বা তাহার সঙ্গে কলহ করিয়া কাল কাটাইতাম। এই করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে যখন সমস্ত জগৎ আপিস করিতেছে তখন আমাদের সুখনিদ্রা প্রগাঢ় হইতেছিল।

এমন সময় কোথা হইতে একটা আঘাত লাগিল, ঘুমের ঘোরও কাটিল– আগেকার মতো পুনশ্চ সুখস্বপ্ন দেখিবার জন্য নয়ন মুদিবার ইচ্ছাও রহিল না; কিন্তু আশ্চর্য এই, আমাদের সেই স্বপ্নের সঙ্গে জাগরণের একটা বিষয়ে মিল রহিয়াই গেল।

তখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম যে, চেষ্টা না করিয়াই আমরা চেষ্টার ফল পাইতে থাকিব; এখনও ভাবিতেছি, ফল পাইবার জন্য প্রচলিত পথে চেষ্টাকে খাটাইবার প্রয়োজন আমরা যেন যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে পারি। স্বপ্নাবস্থাতেও অসম্ভবকে আঁকড়িয়া পড়িয়া ছিলাম, জাগ্রত অবস্থাতেও সেই অসম্ভবকে ছাড়িতে পারিলাম না। শক্তির উত্তেজনা আমাদের মধ্যে অত্যন্ত

বেশি হওয়াতে অত্যাবশ্যক বিলম্বকে অনাবশ্যক বোধ হইতে লাগিল। বাহিরে সেই চিরপুরাতন দৈন্য রহিয়া গিয়াছে, অথচ অন্তরে নবজাগ্রত শক্তির অভিমান মাথা তুলিয়াছে; উভয়ের সামঞ্জস্য করিব কী করিয়া। ধীরে ধীরে? ক্রমে ক্রমে? মাঝখানের প্রকাণ্ড গহ্বরটাকে পাথরের সেতু দিয়া বাঁধিয়া? কিন্তু অভিমান দেরি সহিতে পারে না; মত্ততা বলে, আমার সিঁড়ির দরকার নাই, আমি উড়িব। সময় লইয়া সুসাধ্যসাধন তো সকলেই পারে, অসাধ্যসাধনে আমরা এখনই জগৎকে চমক লাগাইয়া দিব এই কল্পনা আমাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, প্রেম যখন জাগে তখন সে গোড়া হইতে সকল কাজই করিতে চায়, সে ছোটো হইতে বড়ো কিছুকেই অবজ্ঞা করে না, কোনো কর্তব্য পাছে অসমাপ্ত থাকে এই আশঙ্কা তাহার ঘুচে না। প্রেম নিজেকে সার্থক করিতেই চায়, সে নিজেকে প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহে। কিন্তু অপমানের তাড়নায় কেবল আত্মাভিমানমাত্র যখন জাগিয়া উঠে তখন সে বুক ফুলাইয়া বলে, “আমি হাঁটিয়া চলিব না, আমি ডিঙাইয়া চলিব।’ অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য সকলের পক্ষেই যাহা খাটে তার পক্ষে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই; ধৈর্যের প্রয়োজন নাই, অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই; সুদূর উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘ উপায় অবলম্বন করা অনাবশ্যক। ফলে দেখিতেছি, পরের শক্তির প্রতি গতকল্য যেমন অন্ধভাবে প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া ছিলাম, নিজের শক্তির কাছে আজ তেমনি অন্ধ প্রত্যাশা লইয়া আস্ফালন করিতেছি। তখনও যথাবিহিত কর্মকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা ছিল, এখনও সেই চেষ্টাই বর্তমান। কথামালার কৃষকের নিশ্চেষ্ট ছেলেরা যতদিন বাপ বাঁচিয়া ছিল খেতের ধারেও যায় নাই। বাপ চাষ করিত, তাহারা দিব্য খাইত। বাপ যখন মরিল তখন খেতে নামিতে বাধ্য হইল; কিন্তু চাষ করিবার জন্য নহে– তাহারা স্থির করিল, মাটি খুঁড়িয়া একেবারেই দৈবধন পাইবে। বস্তুত চাষের ফসলই যে প্রকৃত দৈবধন এ কথা শিখিতে তাহাদিগকে অনেক বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইয়াছিল। আমরাও যদি এ কথা সহজে না শিখি যে, দৈবধন কোনো অদ্ভুত উপায়ে গোপনে পাওয়া যায় না, পৃথিবীসুদ্ধ লোক সে ধন যেমন করিয়া লাভ করিতেছে ও ভোগ

করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়াই করিতে হইবে, তবে আঘাত এবং দুঃখ কেবল বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে এবং বিপথে যতই অগ্রসর হইব ফিরিবার পথও ততই দীর্ঘ ও দুর্গম হইয়া উঠিবে।

অধৈর্য বা অজ্ঞান-বশত স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু-একটাকে ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয়; তখন সকল উপকরণকেই উপকরণ, সকল উপায়কেই উপায় বলিয়া মনে হয়। তখন ছোটো ছোটো বালকদিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট নির্মমভাবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক রাজার ন্যায় অসামান্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে আমাদের অতিসুকুমার ছোটো ছেলেটিকেই যজ্ঞের অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছি- এই নির্বিচার নিষ্ঠুরতার পাপ চিত্রগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই- তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, বালকদের জন্য বেদনায় সমস্ত দেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। দুঃখ আরো কত সহ্য করিতে হইবে জানি না।

দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে, কিন্তু দুর্মতিকে সম্বরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি তবে অন্তঃকরণকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যায়; ন্যায়ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না, তখন বিশ্বব্যাপী ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠে।

সেই প্রক্রিয়া কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে চলিতেছে এ কথা নম্রহৃদয়ে দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত অপ্রিয়, তাই বলিয়া নীরবে ইহাকে গোপন করিয়া

অথবা অত্যুক্তি দ্বারা ইহাকে ঢাকা দিয়া অনিষ্টকে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে দেওয়া আমাদের কাহারো পক্ষে কর্তব্য নহে।

আমরা সাধ্যমত বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতিসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব, ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না। বহুদিন পূর্বে আমি যখন লিখিয়াছিলাম–

নিজহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে,

তাই যেন রুচে,- -

মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,

তাহে লজ্জা ঘুচে;- -

তখন লর্ড্‌ কার্জনের উপর আমাদের রাগ করিবার কোনো কারণই ঘটে নাই এবং বহুকাল পূর্বে যখন স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দেশী পণ্য প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তখন সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

তথাপি দেশে বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশী পণ্য প্রচার যতবড়ো কাজই হউক লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে এ কথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারি না। বিলম্ব ভালো, প্রতিকূলতা ভালো, তাহাতে ভিত্তিকে পাকা কর্মকে পরিণত করিয়া তুলে; কিন্তু এমন-কোনো ইন্দ্রজাল ভালো নহে যাহা একরাত্রে কোঠা বানাইয়া দেয় এবং আশ্বাস দিয়া বলে “আমাকে উচিত মূল্য নগদ তহবিল হইতে দিবার কোনো প্রয়োজন নাই’। কিন্তু হায়, মনে নাকি ভয় আছে যে, একমুহূর্তের মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টরের কল যদি বন্ধ করিয়া দিতে না পারি তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য

অটল নিষ্ঠার সহিত বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই, সেইজন্য, এবং কোনোমতে হাতে হাতে পার্টিশনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায়, আমরা পথ-বিপথ বিচার করিতেই চাই নাই। এইরূপে চারি দিক হইতে সাময়িক তাগিদের বধিরকর কলকলায় বিভ্রান্ত হইয়া নিজের-প্রতি-বিশ্বাসহীন দুর্বলতা স্বভাবকে অশ্রদ্ধা করিয়া, শুভবুদ্ধিকে অমান্য করিয়া, অতিসত্বর লাভ চুকাইয়া লইতে চায় এবং পরে অতিদীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষতির নিকাশ করিতে থাকে; মঙ্গলকে পীড়িত করিয়া মঙ্গল পাইব, স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিব, ইহা কখনো হইতেই পারে না, এ কথা মনে আনিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না।

আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানি না এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট-ব্যাপারটা অনেক স্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বুঝি, দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের দ্বারা অন্য-সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে, তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্তব্যের নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে। সেইজন্যই স্বাধীনতালাভের দোহাই দিয়া আমরা যথার্থ স্বাধীনতাধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি; দেশে মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া বলপূর্বক একাকার করিয়া দিতে হইবে এইরূপ দুর্মতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত, ইচ্ছা ও আচরণ-বৈচিত্র্যের অপঘাতমৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্বলাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতিকুৎসিত ভাবে গালি দিতেছি; এমন-কি, শারীরিক

সূচিপত্র

আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং আমি ততোধিক নিশ্চয়তররূপে জানি, এরূপ বেনামি শাসনপত্র সময়বিশেষে আমাদের দেশের অনেক লোকেই পাইয়া থাকেন এবং দেশের প্রবীণ ব্যক্তিরাও অপমান হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। জগতে অনেক মহাপুরুষ বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপ্রচারের জন্য নিজের প্রাণও বিসর্জন করিয়াছেন; আমরাও মত প্রচার করিতে চাই, কিন্তু আর-সকলের দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়া একমাত্র কালাপাহাড়কেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে সেই গঠনতত্ত্বটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে। কোন্ সৃজনশক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে। ভেদের লক্ষণই তো চারি দিকে। নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল তখন কোনোমতেই আমরা নিজের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। তাহা যখন পারি না তখন অন্যে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবেই- কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না। অনেকে ভাবেন এ দেশের পরাধীনতা মাথাধরার মতো ভিতরের ব্যাধি নহে, তাহা মাথার বোঝার মতো ইংরেজ-গবর্মেন্ট্-রূপে বাহিরে আমাদের উপরে চাপিয়া আছে; ওইটেকেই যে-কোনোপ্রকারে হোক টান মারিয়া ফেলিলেই পরমুহূর্তে আমরা হালকা হইব। এত সহজ নহে। ইংরেজ-গবর্মেন্ট্ আমাদের পরাধীনতা নয়, তাহা আমাদের গভীরতর পরাধীনতার প্রমাণ মাত্র।

কিন্তু গভীরতর কারণগুলির কথাকে আমল দিবার মতো অবকাশ ও মনের ভাব আজকাল আমাদের নাই। ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগসত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব এই প্রশ্ন যখন উঠে তখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ ত্বরান্বিত তাঁহারা এই বলিয়া কথাটা

সংক্ষেপে উড়াইয়া দেন যে, সুইজর্‌ল্যাণ্ডেও তো একাধিক জাতির সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কি তাহাতে স্বরাজের বাধা ঘটিয়াছে।

এমনতরো নজির দেখাইয়া আমরা নিজেদের ভুলাইতে পারি, কিন্তু বিধাতার চোখে ধুলা দিতে পারিব না; বস্তুত জাতির বৈচিত্র্য থাকিলেও স্বরাজ চলিতে পারে কি না সেটা আসল তর্ক নহে। বৈচিত্র্য তো নানপ্রকারে থাকে- যে পরিবারে দশজন মানুষ আছে সেখানে তো দশটা বৈচিত্র্য। কিন্তু আসল কথা, সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব কাজ করিতেছে কি না। সুইজর্‌ল্যান্ড যদি নানা জাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্তা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে, কিন্তু ঐক্যধর্মের অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা, জাতি, ধর্ম সমাজ ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোটো বড়ো বহুতর ভাগে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

অতএব নজির পাড়িয়া তো নিশ্চিন্ত হইবার কিছু দেখি না। চক্ষু বুজিয়া এ কথা বলিলে ধর্ম শুনিবে না যে, আমাদের আর-সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে, এখন কেবল ইংরেজকে কোনোমতে বাদ দিতে পারিলেই বাঙালিতে পাঞ্জাবিতে মারাঠিতে মাদ্রাজিতে হিন্দুতে মুসলমানে মিলিয়া এক মনে এক প্রাণে এক স্বার্থে স্বাধীন হইয়া উঠিব।

বস্তুত আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা যান্ত্রিক, তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্মবশত ঘটে নাই- পরজাতির এক শাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।

সজীব পদার্থ অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে একত্র থাকিতে থাকিতে জৈবিকভাবে মিলিয়া যায়। এমনি করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে জুড়িয়া বাঁধিয়া কলম লাগাইতে হয়। কিন্তু যতদিন-না কালক্রমে সেই সজীব জোড়টি লাগিয়া যায় ততদিন তো বাহিরের শক্ত বাঁধনটা খুলিলে চলে না। অবশ্য, দড়ার বাঁধনটা নাকি গাছের অঙ্গ নহে; এইজন্য যেমনভাবেই থাক্, যত উপকারই করুক, সে তো গাছকে পীড়া দিবেই, কিন্তু বিভিন্নতাকে যখন ঐক্য দিয়া কলেবরবদ্ধ করিতে হইবে তখনই ওই দড়াটাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যতটুকু প্রয়োজন তাহার চেয়ে সে বেশি বাঁধিয়াছে এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার একমাত্র প্রতিকার– নিজের আভ্যন্তরিক সমস্ত শক্তি দিয়া ঐ জোড়ের মুখে রসে রস মিলাইয়া, প্রাণে প্রাণ যোগ করিয়া জোড়টিকে একান্ত চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা। এ কথা নিশ্চয় বলা যায়, জোড় বাঁধিয়া গেলেই যিনি আমাদের মালি আছেন তিনি আমাদের দড়িদড়া সব কাটিয়া দিবেন। ইংরেজ-শাসন-নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার ‘পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া, সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা, বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে। একত্রসংঘটনমূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে স্বহস্তে গড়িতে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।

শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ইংরেজের প্রতি দেশের সর্বসাধারণের বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে। প্রাচ্য পরজাতীয়ের প্রতি স্বাভাবিক নির্মমতায় ইংরেজ ঔদাসীন্যে ও ঔদ্ধত্যে ভারতবর্ষের ছোটো বড়ো সকলকেই ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। যত দিন যাইতেছে, এই বেদনার তপ্ত শেল গভীর ও গভীরতর রূপে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অনুবিদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। এই নিত্যবিস্তারপ্রাপ্ত বেদনার ঐক্যেই ভারতের নানা জাতি

মিলিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব এই বিদ্বেষকেই আমাদের প্রধান আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতে হইবে।

এ কথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এ দেশ ত্যাগ করিবে, তখনই কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব। তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।

“ততদিনে যেমন করিয়াই হউক একটা-কিছু সুযোগ ঘটিয়া যাইবেই– আপাতত এইভাবেই চলুক’ এমন কথা যিনি বলেন তিনি এ কথা ভুলিয়া যান যে, দেশ তাঁহার একলার সম্পত্তি নহে; ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেও এ দেশ রহিয়া যাইবে। ট্রাস্ট যেমন সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায় ব্যতীত ন্যস্ত ধনকে নিজের ইচ্ছামতো যেমন-তেমন করিয়া খাটাইতে পারেন না তেমনি দেশ যখন বহু লোকের এবং বহু কালের, তাহার মঙ্গলকে কোনো সাময়িক ক্ষোভের বেগে অদূরদর্শী আপাত-বুদ্ধির সংশয়াপন্ন ব্যবস্থার হাতে চক্ষু বুঝিয়া সমর্পণ করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই। স্বদেশের ভবিষ্যৎ যাহাতে দায়গ্রস্ত হইয়া উঠিতেও পারে এমনতরো নিতান্ত ঢিলা বিবেচনার কাজ বর্তমানের প্ররোচনায় করিয়া ফেলা কোনো লোকের পক্ষে কখনোই কর্তব্য হইতে পারে না। কর্মের ফল যে আমার একলার নহে, দুঃখ যে অনেকের।

তাই বারম্বার বলিয়াছি এবং বারম্বার বলিব– শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলই বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া, ওই পরের দিক হইতে ভ্রূকুটিকুটিল মুখটাকে ফিরাও, আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন

করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষ্ণাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, নানাদিগ্‌ভিমুখী মঙ্গলচেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেলো, কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো– এমন উদার করিয়া

এতদূর বিস্তৃত করো যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও খৃস্টান, সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে। আমাদের প্রতি রাজার সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু কখনোই আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না– আমরা জয়ী হইবই– বাধার উপরে উন্মাদের মতো নিজের মাথা ঠুকিয়া নহে, অটল অধ্যবসায়ে তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ অতিক্রম করিয়া। কেবল যে জয়ী হইব তাহা নহে, কার্যসিদ্ধির সত্যসাধনাকে দেশের মধ্যে চিরদিনের মতো সঞ্চিত করিয়া তুলিব; আমাদের উত্তরপুরুষদের জন্য শক্তি-চালনার সমস্ত পথ একটি একটি করিয়া উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিব।

আজ ওই-যে বন্দিশালায় লৌহশৃঙ্খলের কঠোর ঝংকার শুনা যাইতেছে, দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে, ইহাকেই অত্যন্ত বড়ো করিয়া জানিয়ো না। যদি কান পাতিয়া শোন তবে কালের মহাসংগীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কত যুগ হইতে বিপ্লবের আবর্ত, কত উৎপীড়নের মন্থন, এ দেশের সিংহদ্বারে কত বড়ো বড়ো রাজপ্রতাপের প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের পরিপূর্ণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে; অদ্যকার ক্ষুদ্র দিন তাহার যে ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু ইহার সহিত মিলিত করিতেছে আর কিছুকাল পরে সমগ্রের মধ্যে তাহা কি কোথাও দৃষ্টিগোচর হইবে। ভয় করিব না, ক্ষুব্ধ হইব না, ভারতবর্ষের যে পরমমহিমা সমস্ত কঠোর দুঃখসংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সৃজনানন্দকে বহন করিয়া ব্যক্ত

হইয়া উঠিতেছে- ভক্তসাধকের প্রশান্ত ধ্যাননেত্রে তাহার অখণ্ড মূর্তি উপলব্ধি করিব। চারি দিকের কোলাহল ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে সাধনাকে মহৎলক্ষ্যের দিকে অবিচলিত রাখিব। নিশ্চয় জানিব, এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানবচিত্তের সমস্ত আকাঙক্ষাবেগ মিলিত হইয়াছে- এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসংকুল- এত বহুত্ব, এত বেদনা, এত সংঘাত কোনো দেশই এত দীর্ঘকাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না- কিন্তু একটি অতিবৃহৎ অতিমহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই-সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে, পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই। এই-যে সমস্ত নানা বিচিত্র উপকরণ কালকালান্তর ও দেশদেশান্তর হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি-দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না। জানি, বাহির হইতে অন্যায় এবং অপমান আমাদের এমন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতেছে যাহা আঘাত করিতেই জানে, যাহা ধৈর্য মানে না, যাহা বিনাশ স্বীকার করিয়াও নিজের চরিতার্থতাকেই সার্থকতা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু সেই আত্মাভিমানের প্রমত্ততাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে সুগম্ভীর আত্মগৌরব সঞ্চার করিবার অন্তরতর শক্তি কি ভারতবর্ষ আমাদিগকে দান করিবেন না। যাহারা নিকটে আসিয়া আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে ঘৃণা করে, যাহারা দূর হইতে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ উদ্‌গার করে সেই-সকল ক্ষণকালীন-বায়ুদ্বারা-স্ফীত সংবাদপত্রের মর্মরধ্বনি, সেই বিলাতের টাইম্‌স্ অথবা এ দেশের টাইম্‌স্ অফ ইন্ডিয়ার বিদ্বেষতীক্ষ্ণ বাণীই কি অঙ্কুশাঘাতের মতো আমাদিগকে বিরোধের পথে অন্ধবেগে চালনা করিবে। আর ইহা অপেক্ষা সত্যতার নিত্যতর বাণী আমাদের পিতামহদের পবিত্র মুখ দিয়া কি এ দেশে উচ্চারিত হয় নাই- যে বাণী দূরকে নিকট করিতে বলে, পরকে আত্মীয় করিতে আহ্বান করে, সেই-সকল শান্তিগম্ভীর সনাতন

কল্যাণবাক্যই আজ পরাস্ত হইবে? ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব যাহাতে শত্রুমিত্রভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে, ক্ষমার বীর্যে, প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনোই অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য করিয়া লইব। দুঃখবেদনার একান্ত পীড়নের মধ্য দিয়াই যাত্রা করিয়া আজ উদার আনন্দে মন হইতে সমস্ত বিদ্রোহ-ভাব দূর করিয়া দিব; জানিয়া এবং না জানিয়া বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য মন্দির নানা ধর্ম, নানা শাস্ত্র, নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাধনাতেই যোগদান করিব; নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টিশক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনাকার্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব। তাহা যদি করিতে পারি, যদি জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে ভারতবর্ষের এই অভিপ্রায়ের মধ্যে সমস্ত প্রাণ দিয়া নিযুক্ত হইতে পারি, তবেই মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই এক সত্য, সেই নিত্য সত্যকে দেখিতে পাইব, ঋষিরা যাঁহাকে বলিয়াছেন–

স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্–

তিনিই সমস্ত লোকের বিধৃতি, তিনিই সমস্ত বিচ্ছেদের সেতু এবং তাঁহাকেই বলা হইয়াছে–

তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যম্–

সেই যে ব্রহ্ম, নিখিলের সমস্ত প্রভেদের মধ্যে ঐক্যরক্ষার যিনি সেতু ইঁহারই নাম সত্য।

১৩১৫

সূচিপত্র

সমস্যা

আমি “পথ ও পাথেয়’ নামক প্রবন্ধে আমাদের কর্তব্য এবং তাহার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধটিকে সকলে যে অনুকূলভাবে গ্রহণ করিবেন এমন আমি আশা করি নাই।

কোন্‌টা শ্রেয় এবং তাহা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়টি কী তাহা লইয়া তো কোনো দেশেই আজও তর্কের অবসান হয় নাই। মানুষের ইতিহাসে এই তর্ক কত রক্তপাতে পরিণত হইয়াছে এবং এক দিক হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া আর-এক দিক দিয়া বার বার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশে দেশহিত সম্বন্ধে মতভেদ এতকাল কেবল মুখে মুখে এবং কাগজে কাগজে, কেবল ছাপাখানায় এবং সভাক্ষেত্রে কথার লড়াই রূপেই সঞ্চরণ করিয়াছে। তাহা কেবল ধোঁয়ার মতো ছড়াইয়াছে, আগুনের মতো জ্বলে নাই।

কিন্তু আজ নাকি সকলেই পরস্পরের মতামতকে দেশের হিতাহিতের সঙ্গে আসন্ন ভাবে জড়িত মনে করিতেছেন, তাহাকে কাব্যালংকারের ঝংকারমাত্র বলিয়া গণ্য করিতেছেন না, সেইজন্য যাঁহাদের সহিত আমার মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে তাঁহাদের প্রতিবাদবাক্যে যদি কখনো পরুষতা প্রকাশ পায় তাহাকে আমি অসংগত বলিয়া ক্ষোভ করিতে পারি না। এ সময়ে কোনো কথা বলিয়া কেহ অল্পের উপর দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া যান না- ইহা সময়ের একটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

তবু তর্কের উত্তেজনা যতই প্রবল হোক, যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কোনো জায়গায় মতের অনৈক্য ঘটিতেছে দেশের হিতসাধনে তাঁহাদের

আন্তরিক নিষ্ঠা আছে এই শ্রদ্ধা যখন নষ্ট হইবার কোনো কারণ দেখি না, তখন আমরা পরস্পর কী কথা বলিতেছি, কী ইচ্ছা করিতেছি, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। গোড়াতেই রাগ করিয়া বসিলে অথবা বিরুদ্ধপক্ষের বুদ্ধির প্রতি সন্দেহ করিলে নিজের বুদ্ধিকে হয় তো প্রতারিত করা হইবে। বুদ্ধির তারতম্যেই যে মতের অনৈক্য ঘটে এ কথা সকল সময়ে খাটে না। অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতিভেদেই মতভেদ ঘটে। অতএব মতের ভিন্নতার প্রতি সম্মান রক্ষা করিলে যে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অসম্মান করা হয় তাহা কদাচই সত্য নহে।

এইটুকুমাত্র ভূমিকা করিয়া “পথ ও পাথেয়’ প্রবন্ধে যে আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছিলাম তাহারই অনুবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংসারে বাস্তবের সঙ্গে আমাদিগকে কখনো আপস করিয়া কখনো-বা লড়াই করিয়া চলিতে হয়। অন্ধতা বা চাতুরীর জোরে বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা অতি ছোটো কাজটুকুও করিতে পারি না।

অতএব দেশহিতের সংকল্প সম্বন্ধে যখন আমরা তর্ক করি তখন সেই তর্কের একটি প্রধান কথা এই যে, সংকল্পটি যতই বড়ো হোক এবং যতই ভালো হোক, বাস্তবের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য আছে কি না। কোন্ ব্যক্তির চেক-বহির পাতায় কতগুলা অঙ্ক পড়িয়াছে তাহা লইয়াই তাড়াতাড়ি উৎসাহ করিবার কারণ নাই, কোন্ ব্যক্তির চেক ব্যাঙ্কে চলে তাহাই দেখিবার বিষয়।

সংকটের সময় যখন কাহাকেও পরামর্শ দিতে হইবে তখন এমন পরামর্শ দিলে চলে না যাহা অত্যন্ত সাধারণ। কেহ যখন রিক্তপাত্র লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে থাকে কেমন করিয়া তাহার পেট ভরিবে তখন তাহাকে এই কথাটি বলিলে তাহার প্রতি হিতৈষিতা প্রকাশ করা হয় না যে, ভালো করিয়া অন্নপান করিলেই ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই উপদেশের জন্যই সে এতক্ষণ

কপালে হাত দিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। সত্যকার চিন্তার বিষয় যেটা সেটাকে লঙ্ঘন করিয়া যতবড়ো কথাই বলি-না কেন, তাহা একেবারেই বাজে কথা।

ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও প্রধান প্রয়োজনটা কী সে কথা আলোচনা উপলক্ষে আমরা যদি তাহার বর্তমান বাস্তব অভাব ও বাস্তব অবস্থাকে একেবারেই চাপা দিয়া একটা খুব মস্ত নীতিকথা বলিয়া বসি তবে শূন্য তহবিলের চেকের মতো সে কথার কোনো মূল্য নাই; তাহা উপস্থিতমতো ঋণের দাবি শান্ত করিবার একটা কৌশলমাত্র হইতে পারে কিন্তু পরিণামে তাহা দেনাদার বা পাওনাদার কাহারও পক্ষে কিছুমাত্র কল্যাণকর হইতে পারে না।

“পথ ও পাথেয়’ প্রবন্ধে আমি যদি সেইরূপ ফাঁকি চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি তবে বিচার-আদালতের ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারিব না। আমি যদি বাস্তবকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া কেবল একটা ভাবের ভুয়া দলিল গড়িয়া থাকি তবে সেটাকে সর্বসমক্ষে খণ্ডবিখণ্ড করাই কর্তব্য। কারণ, ভাব যখন বাস্তবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দেখা দেয় তখন গাঁজা বা মদের মতো তাহা মানুষকে অকর্মণ্য এবং উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কোন্‌টা যে প্রকৃত বাস্তব তাহা নির্ণয় করা সোজা নহে। সেইজন্যই অনেক সময় মানুষ মনে করে, যেটাকে চোখে দেখা যায় সেটাই সকলের চেয়ে বড়ো বাস্তব; যেটা মানবপ্রকৃতির নিচের তলায় পড়িয়া থাকে সেটাই আসল সত্য। কোনো ইংরাজ-সাহিত্যসমালোচক রামায়ণের অপেক্ষা ইলিয়ডের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার কালে বলিয়াছেন, ইলিয়ড্‌ কাব্য অধিকতর হিউম্যান, অর্থাৎ মানব-চরিত্রের বাস্তবকে বেশি করিয়া স্বীকার করিয়াছে– কারণ, উক্ত কাব্যে একিলিস্‌ নিহত শত্রুর মৃতদেহকে রথে বাঁধিয়া ট্রয়ের পথের ধুলায় লুটাইয়া বেড়াইয়াছেন, আর রামায়ণে রাম পরাজিত

শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছেন। ক্ষমা অপেক্ষা প্রতিহিংসা মানব-চরিত্রের পক্ষে অধিকতর বাস্তব এ কথার অর্থ যদি এই হয় যে, তাহা পরিমাণে বেশি তবে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থূল পরিমাণই বাস্তবতা পরিমাপের একমাত্র বাটখারা এ কথা মানুষ কোনোদিনই স্বীকার করিতে পারে না; এইজন্যই মানুষ ঘর-ভরা অন্ধকারের চেয়ে ঘরের কোণের একটি ক্ষুদ্র শিখাকেই বেশি মান্য করিয়া থাকে।

যাহাই হউক, এ কথা সত্য যে, মানব-ইতিহাসের বহুতর উপকরণের মধ্যে কোন্‌টা প্রধান কোন্‌টা অপ্রধান, কোন্‌টা বর্তমানের পক্ষে একান্ত বাস্তব এবং কোন্‌টা নহে, তাহা একবার কেবল চোখে দেখিয়াই মীমাংসা করা যায় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে পারি, উত্তেজনার সময় উত্তেজনাটাকেই সকলের চেয়ে বড়ো সত্য বলিয়া মনে হয়। রাগের সময় এমন কোনো কথাকেই বাস্তবমূলক বলিয়া মনে হয় না যাহা রাগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। এরূপ সময় মানুষ সহজেই বলিয়া উঠে, “রেখে দাও তোমার ধর্মকথা।’ বলে যে, তাহার কারণ এ নয় যে, ধর্মকথাটাই বাস্তব প্রয়োজনের পক্ষে অযোগ্য এবং রুষ্ট বুদ্ধিই তদপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, বাস্তব উপযোগিতার প্রতি আমি দৃক্‌পাত করিতে চাই না; বাস্তব প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকেই আমি মান্য করিতে চাই।

কিন্তু প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাতে বাস্তবের হিসাব অল্পই করিতে হয়, উপযোগিতায় তাহার চেয়ে অনেক বেশি করা আবশ্যক। ম্যুটিনির পর যে ইংরেজেরা ভারতবর্ষকে নির্দয়ভাবে দলন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল তাহারা মানবচরিত্রের বাস্তবের হিসাবটাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছিল; রাগের সময় এইপ্রকার সংকীর্ণ হিসাব করাই যে স্বাভাবিক, অর্থাৎ মাথা-গনতিতে অধিকাংশ লোকই করিয়া থাকে তাহা ঠিক, কিন্তু লর্ড ক্যানিং ক্ষমার দিক দিয়া যে বাস্তবের হিসাব করিয়াছিলেন তাহা প্রতিহিংসার

হিসাব অপেক্ষা বাস্তবকে অনেক বৃহৎপরিমাণে, অনেক গভীর এবং দূরবিস্তৃতভাবেই গণনা করিয়াছিল।

কিন্তু যাহারা ক্রুদ্ধ তাহারা ক্যানিঙের ক্ষমানীতিকে সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম্‌ অর্থাৎ বাস্তববর্জিত ভাব-বাতিকতা বলিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হয় নাই। চিরদিনই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। যে পক্ষ অক্ষৌহিণী সেনাকেই গণনাগৌরবে বড়ো সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞাপূর্বক নিজের পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি, তবে নারায়ণ যতই একলা হোন এবং যতই ক্ষুদ্রমূর্তি ধরিয়া আসুন, তিনিই জিতাইয়া দিবেন।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, যথার্থ বাস্তব যে কোন্‌ পক্ষে আছে তাহা সাময়িক উত্তেজনার প্রাবল্য বা লোকগণনার প্রাচুর্য হইতে স্থির করা যায় না। কোনো-একটা কথা শান্তরসাশ্রিত বলিয়াই যে তাহা বাস্তবিকতায় খর্ব, এবং যাহা মানুষকে এত বেগে তাড়না করে যে পথ দেখিবার কোনো অবসর দেয় না তাহাই যে বাস্তবকে অধিক মান্য করিয়া থাকে, এ কথা আমরা স্বীকার করিব না।

“পথ ও পাথেয়’ প্রবন্ধে আমি দুইটি কথার আলোচনা করিয়াছি। প্রথমত, ভারতবর্ষের পক্ষে দেশহিত-ব্যাপারটা কী। অর্থাৎ তাহা দেশী কাপড় পরা বা ইংরাজ তাড়ানো বা আর-কিছু? দ্বিতীয়ত, সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া।

ভারতবর্ষের পক্ষে চরম হিত যে কী তাহা বুঝিবার বাধা যে কেবল আমরা নিজেরা উপস্থিত করিতেছি তাহা নহে, বস্তুত তাহার সর্বপ্রধান বাধা আমাদের প্রতি ইংরাজের ব্যবহার। ইংরাজ কোনোমতেই আমাদের প্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিতেই চায় না। তাহারা মনে করে, তাহারা যখন

রাজা তখন জবাবদিহি কেবলমাত্র আমাদেরই; তাহাদের একেবারেই নাই। বাংলাদেশের একজন ভূতপূর্ব হর্তাকর্তা ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যতকিছু উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন সমস্তই ভারতবাসীর প্রতি। তাঁহার মত এই যে–কাগজগুলাকে উচ্ছেদ করো, সুরেন্দ্রবাঁড়ুজ্যে–বিপিনপালকে দমন করিয়া দাও। দেশকে ঠাণ্ডা করিবার এই একমাত্র উপায় যাহারা অনায়াসে কল্পনা ও নিঃসংকোচে প্রচার করিতে পারে তাহাদের মতো ব্যক্তি যে আমাদের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহাই কি দেশের রক্ত গরম করিয়া তুলিবার পক্ষে অন্তত একটা প্রধান কারণ নহে। ইংরাজের গায়ে জোর আছে বলিয়াই মানবপ্রকৃতিকে মানিয়া চলা কি তাহার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক। ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য-নিবারণের পক্ষে ভারতের-পেনসন-ভোগী এলিয়টের কি তাঁহার জাতভাইকে একটি কথাও বলিবার নাই। যাহাদের হাতে ক্ষমতা অজস্র তাহাদিগকেই আত্মসম্বরণ করিতে হইবে না, আর যাহারা স্বভাবতই অক্ষম শমদমনিয়মসংযমের সমস্ত ব্যবস্থা কেবল তাহাদেরই জন্য! তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ইংরেজের গায়ে যাহারা হাত তোলে তাহারা যাহাতে কোনোমতেই নিষ্কৃতি না পায় সেজন্য সতর্ক হইতে হইবে। আর যে-সকল ইংরাজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কেবলই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া ব্রিটিশ-বিচার সম্বন্ধে চিরস্থায়ী কলঙ্কের রেখা আগুন দিয়া ভারতবর্ষের চিত্তে দাগিয়া দাগিয়া দিতেছে তাহাদের সম্বন্ধেই সতর্ক হইবার কোনো প্রয়োজন নাই? বলদর্পে অন্ধ ধর্মবুদ্ধিহীন এইরূপ স্পর্ধাই কি ভারতবর্ষে ইংরাজশাসনকে এবং ইংরেজের প্রজাকে উভয়কেই ভ্রষ্ট করিতেছে না। অক্ষম যখন অস্থিমজ্জায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরে, যখন হাতে হাতে অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার কাছে মানবধর্মের আর-কোনো উচ্চতর দাবি তাহার কাছে কোনোমতেই রুচিতে চাহে না তখন কেবল ইংরাজের রক্তচক্ষু পিনাল-কোডই ভারতবর্ষে শান্তিবর্ষণ করিতে পারে এত শক্তি ভগবান ইংরেজের হাড়ে দেন নাই। ইংরেজ জেলে দিতে পারে, ফাঁসি দিতে পারে, কিন্তু স্বহস্তে অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিয়া তার পরে পদাঘাতের দ্বারা তাহা নিবাইয়া দিতে পারে

না- যেখানে জলের দরকার সেখানে রাজা হইলেও তাহাকে জল ঢালিতে হইবে। তাহা যদি না করে, নিজের রাজদণ্ডকে যদি বিশ্ববিধানের চেয়ে বড়ো বলিয়া জ্ঞান করে, তবে সেই ভয়ংকর অন্ধতাবশতই দেশে পাপের বোঝা স্তূপীকৃত হইয়া একদিন সেই ঘোরতর অসামঞ্জস্য একটা নিদারুণ বিপ্লবে পরিণত না হইয়া থাকিতেই পারে না। প্রতিদিন দেশের অন্তরে অন্তরে যে চিত্রবেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া আত্মপ্রসাদস্ফীত ইংরেজ উড়াইয়া দিতে পার- মর্লি তাহাকে না মানাই রাষ্ট্রনীতিক সুবুদ্ধিতা বলিয়া মনে করিতে পার, এবং এলিয়ট তাহাকে পরাধীন জাতির স্পর্ধামাত্র মনে করিয়া বৃদ্ধবয়সেও দন্তের উপর দন্তঘর্ষণের অসংগত চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু তাই বলিয়া অক্ষমেরও এই বেদনার হিসাব কি কেহই রাখিতেছে না মনে কর। বলিষ্ঠ যখন মনে করে যে, নিজের অন্যায় করিবার অবাধ অধিকারকে সে সংযত করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য প্রতিকারচেষ্টা মানবহৃদয়ে ক্রমশই ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবে, তখনই বলের দ্বারাই প্রবল আপনার বলের মূলে আঘাত করে- কারণ, তখন সে অশক্তকে আঘাত করে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে শক্তি আছে সেই বজ্রশক্তির বিরুদ্ধে নিজের বদ্ধমুষ্টি চালনা করে। যদি এমন কথা তোমরা বল, ভারতবর্ষে আজ যে ক্ষোভ নিরস্ত্রকেও নিদারুণ করিয়া তুলিতেছে, যাহা অক্ষমের ধৈর্যকেও অভিভূত করিয়া তাহাকে নিশ্চিত আত্মঘাতের অভিমুখে তাড়না করিতেছে, তাহাতে তোমাদের কোনো হাত নাই- তোমরা ন্যায়কে কোথাও পীড়িত করিতেছ না, তোমরা স্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রতিদিন তোমাদের উপকারকে উপকৃতের নিকট নিতান্তই অরুচিকর করিয়া তুলিতেছ না- যদি কেবল আমাদেরই দিকে তাকাইয়া এই কথাই বল যে, অকৃতার্থের অসন্তোষ ভারতের পক্ষে অকারণ অপরাধ এবং অপমানের দুঃখদাহ ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অকৃতজ্ঞতা- তবে সেই মিথ্যাবাক্যকে রাজতক্তে বসিয়া বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে এবং

তোমাদের টাইম্‌সের পত্রলেখক, ডেলি মেলের সংবাদরচয়িতা এবং পায়োনিয়র-ইংলিশ্‌ম্যানের সম্পাদকে মিলিয়া তাহাকে ব্রিটিশ পশুরাজের ভীমগর্জনে পরিণত করিলেও সেই অসত্যের দ্বারা তোমরা কোনো শুভফল পাইবে না। তোমার গায়ে জোর আছে বটে, তবু সত্যের বিরুদ্ধেও তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে এত জোর নাই। নূতন আইনের দ্বারা নূতন লোহার শিকল গড়িয়া তুমি বিধাতার হাত বাঁধিতে পারিবে না।

অতএব মানবপ্রকৃতির সংঘাতে বিশ্বের নিয়মে যে আবর্ত পাক খাইয়া উঠিতেছে তাহার ভীষণত্ব স্মরণ করিয়া আমার প্রবন্ধটুকুর দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিব এমন দুরাশা আমার নাই। দুর্বুদ্ধি যখন জাগ্রত হইয়া উঠে তখন এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সেই দুর্বুদ্ধির মূলে বহুদিনের বহুতর কারণ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল; এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যেখানে এক পক্ষকে সর্বপ্রকারে অক্ষম ও অনুপায় করা হইয়াছে সেখানে ক্রমশই অপর পক্ষের বুদ্ধিভ্রংশ ও ধর্মহানি ঘটা একেবারেই অনিবার্য। যাহাকে নিয়তই অশ্রদ্ধা অসম্মান করি তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া মানুষ কদাচই আত্মসম্মানকে উজ্জ্বল রাখিতে পারে না; দুর্বলের সংস্রবে সবল হিংস্র হইয়া উঠে এবং অধীনের সংস্রবে স্বাধীন অসংযত হইতে থাকে- স্বভাবের এই নিয়মকে কে ঠেকাইতে পার? অবশেষে জমিয়া উঠিতে উঠিতে ইহার কি কোথাও কোনোই পরিণাম নাই। বাধাহীন কর্তৃত্বে চরিত্রের অসংযম যখন বুদ্ধির অন্ধতাকে আনয়ন করে তখন কি কেবল তাহা দরিদ্রেরই ক্ষতি এবং দুর্বলেরই দুঃখের কারণ হয়।

এইরূপে বাহিরের আঘাতে বহুদিন হইতে দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনা ক্রমশই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সত্যটুকুকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এবং ইংরেজ সমস্ত শাসন ও সতর্কতা কেবল একটা দিকে, কেবল দুর্বলের দিকে চাপান দিয়া যে-একটা অসমতার সৃষ্টি

করিতেছে তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত বুদ্ধিকে সমস্ত কল্পনাকে সমস্ত বেদনাবোধকে অহরহ অতিরিক্ত পরিমাণে এই বাহিরের দিকেই, এই একটা নৈমিত্তিক উৎপাতের দিকেই উদ্রিক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব এমন অবস্থায় দেশের কোন্ কথাটা সকলের চেয়ে বড়ো কথা তাহা যদি একেবারেই ভুলিয়া যাই তবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যাহা প্রাকৃতিক তাহা দুর্নিবার হইলেও তাহা সকল সময়ে শ্রেয়স্কর হয় না। হৃদয়াবেগের তীব্রতাকেই পৃথিবীর সকল বাস্তবের চেয়ে বড়ো বাস্তব বলিয়া মনে করিয়া আমরা যে অনেক সময়েই ভয়ংকর ভ্রমে পড়িয়া থাকি, সংসারে এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। জাতির ইতিহাসেও যে এ কথা আরো অনেক বেশি খাটে তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

“আচ্ছা, ভালো কথা, তুমি কোন্‌টাকে দেশের সকলের চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলিয়া মনে কর’ এই প্রশ্নটাই অনেকে বিশেষ বিরক্তির সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা আমি অনুভব করিতেছি। এই বিরক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াও আমাকে উত্তর দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে বিধাতা যে সমস্যাটি স্থাপিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইতে পারে, কিন্তু সমস্যাটি যে কী তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। তাহা নিতান্তই আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে; অন্য দূরদেশের ইতিহাসের নজিরের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইলে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

ভারতবর্ষের পর্বতপ্রান্ত হইতে সমুদ্রসীমা পর্যন্ত যে জিনিসটি সকলের চেয়ে সুস্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেছে, সেটি কী। সেটি এই যে, এত ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার জগতে আর কোনো একটিমাত্র দেশে নাই।

পশ্চিমদেশের যে-সকল ইতিহাস ইস্কুলে পড়িয়াছি তাহার কোথাও আমরা এরূপ সমস্যার পরিচয় পাই নাই। য়ুরোপে যে-সকল প্রভেদের মধ্যে সংঘাত বাধিয়াছিল সে প্রভেদগুলি একান্ত ছিল না; তাহাদের মধ্যে মিলনের এমন-একটি সহজ তত্ত্ব ছিল যে, যখন তাহারা মিলিয়া গেল তখন তাহাদের মিলনের মুখে জোড়ের চিহ্নটুকু পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইল। প্রাচীন য়ুরোপে গ্রীক রোমক গথ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাহিরে শিক্ষাদীক্ষার পার্থক্য যতই থাক্ তাহারা প্রকৃতই একজাতি ছিল। তাহারা পরস্পরের ভাষা বিদ্যা রক্ত মিলাইয়া এক হইয়া উঠিবার জন্য স্বতই প্রবণ ছিল। বিরোধের উত্তাপে তাহারা গলিয়া যখনই মিলিয়া গেছে তখনই বুঝা গিয়াছে তাহারা এক ধাতুতেই গঠিত। ইংলন্ডে একদিন স্যাক্সন্ নর্মান ও কেল্টিক জাতির একত্র সংঘাত ঘটিয়াছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন-একটি স্বাভাবিক ঐক্যতত্ত্ব ছিল যে, জেতা জাতি জেতারূপে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারিল না; বিরোধ করিতে করিতেই কখন যে এক হইয়া গেল তাহা জানাও গেল না।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতায় মানুষের সঙ্গে মানুষকে যে ঐক্যে সংগত করিয়াছে তাহা সহজ ঐক্য। য়ুরোপ এখনও এই সহজ ঐক্যকেই মানে- নিজের সমাজের মধ্যে কোনো গুরুতর প্রভেদকে স্থান দিতেই চায় না, হয় তাহাকে মারিয়া ফেলে নয় তাড়াইয়া দেয়। য়ুরোপের যে-কোনো জাতি হোক-না কেন, সকলেরই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বার উদ্‌ঘাটিত রাখিয়াছে আর এশিয়াবাসীমাত্রই যাহাতে কাছে ঘেঁষিতে না পারে সেজন্য তাহাদের সতর্কতা সাপের মতো ফোঁস করিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এইখানেই গোড়া হইতেই অনৈক্য দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস যখনই শুরু হইল সেই মুহূর্তেই বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, আর্যের সঙ্গে অনার্যের বিরোধ ঘটিল। তখন হইতে এই বিরোধের দুঃসাধ্য সমন্বয়ের চেষ্টায় ভারতবর্ষের চিত্ত ব্যাপৃত রহিয়াছে। আর্যসমাজে

যিনি অবতার বলিয়া গণ্য সেই রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে আর্য-উপনিবেশকে অগ্রসর করিয়া দিবার উপলক্ষে যেদিন গুহক চণ্ডালরাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন, যেদিন কিষ্কিন্ধ্যার অনার্যগণকে উচ্ছিন্ন না করিয়া সহায়তায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কার পরাস্ত রাক্ষসরাজ্যকে নির্মূল করিবার চেষ্টা না করিয়া বিভীষণের সহিত বন্ধুতার যোগে শত্রুপক্ষের শত্রুতা নিরস্ত করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতবর্ষের অভিপ্রায় এই মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত এ দেশে মানুষের যে সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের আর অন্ত রহিল না। যে উপকরণগুলি কোনোমতেই মিলিতে চায় না, তাহাদিগকে একত্রে থাকিতে হইল। এমন ভাবে কেবল বোঝা তৈরি হয়, কিন্তু কিছুতেই দেহ বাঁধিয়া উঠিতে চায় না। তাই এই বোঝা ঘাড়ে করিয়াই ভারতবর্ষকে শত শত বৎসর ধরিয়া কেবলই চেষ্টা করিতে হইয়াছে, যাহারা বিচ্ছিন্ন কী উপায়ে সমাজের মধ্যে তাহারা সহযোগীরূপে থাকিতে পারে; যাহারা বিরুদ্ধ কী উপায়ে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষা করা সম্ভব হয়; যাহাদের ভিতরকার প্রভেদ মানবপ্রকৃতি কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারে না, কিরূপ ব্যবস্থা করিলে সেই প্রভেদ যথাসম্ভব পরস্পরকে পীড়িত না করে– অর্থাৎ কী করিলে স্বাভাবিক ভেদকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াও সামাজিক ঐক্যকে যথাসম্ভব মান্য করা যাইতে পারে।

নানা বিভিন্ন লোক যেখানে একত্রে আছে সেখানকার প্রতিমুহূর্তের সমস্যাই এই যে, এই পার্থক্যের পীড়া এই বিভেদের দুর্বলতাকে কেমন করিয়া দূর করা যাইতে পারে। একত্রে থাকিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই এক হইতে পারিব না, মানুষের পক্ষে এতবড়ো অমঙ্গল আর কিছুই হইতে পারে না। এমন অবস্থায় প্রথম চেষ্টা হয়, প্রভেদকে সুনির্দিষ্ট গণ্ডিদ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া– পরস্পর পরস্পরকে আঘাত না করে সেইটি সামলাইয়া

যাওয়া- পরস্পরের চিহ্নিত অধিকারের সীমা কেহ কোনো দিক হইতে লঙ্ঘন না করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা।

কিন্তু এই নিষেধের গণ্ডিগুলি যাহা প্রথম অবস্থায় বহুবিচিত্রকে একত্রে অবস্থানে সহায়তা করে তাহাই কালক্রমে নানাকে এক হইয়া উঠিতে বাধা দিতে থাকে। তাহা আঘাতকেও বাঁচায়, তেমনি মিলনকেও ঠেকায়। অশান্তিকে দূরে খেদাইয়া রাখাই যে শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করা তাহা নহে। বস্তুত তাহাতে অশান্তিকে চিরদিনই কোনো-একটা জায়গায় জিয়াইয়া রাখা হয়; বিরোধকে কোনোমতে দূরে রাখিলেও তবু তাহাকে রাখা হয়- ছাড়া পাইলেই তাহার প্রলয়মূর্তি হঠাৎ আসিয়া দেখা দেয়।

শুধু তাই নয়। ব্যবস্থাবদ্ধভাবে একত্রে অবস্থান মাত্র মিলনের নেতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক নহে। তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে, কিন্তু শক্তি পাইতে পারে না। শৃঙ্খলার দ্বারা কাজ চলে মাত্র, ঐক্যের দ্বারা প্রাণ জাগে।

ভারতবর্ষও এতকাল তাহার বহুতর অনৈক্য ও বিরুদ্ধতাকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া প্রত্যেককে এক-একটি প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত ছিল। অন্য কোনো দেশেই এমন সত্যকার প্রভেদ একত্রে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, সুতরাং অন্য কোনো দেশেরই এমন দুঃসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইবার কোনো প্রয়োজনই হয় নাই।

নানা বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন সত্য যখন স্তূপাকার হইয়া জ্ঞানের পথরোধ করিবার উপক্রম করে তখন বিজ্ঞানের প্রথম কাজ হয় তাহাদিগকে গুণকর্ম অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ফেলা। কিন্তু, কি বিজ্ঞানে কি সমাজে, শ্রেণীবদ্ধ করা আরম্ভের কাজ; কলেবর-বদ্ধ করাই চূড়ান্ত ব্যাপার। ইঁটকাঠ চুনসুরকি পাছে বিমিশ্রিত হইয়া পরস্পরকে নষ্ট করে এইজন্য তাহাদিগকে ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখাই যে ইমারত নির্মাণ করা তাহা নহে।

আমাদের দেশেও শ্রেণীবিভাগ হইয়া আছে, কিন্তু রচনাকার্য হয় আরম্ভ হয় নাই, নয় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। একই বেদনার অনুভূতির দ্বারা আদ্যোপান্ত আবিষ্ট, প্রাণময় রসরক্তময় স্নায়ুপেশীমাংসের দ্বারা অস্থিরাশি যেমন করিয়া ঢাকা পড়ে তেমনি করিয়াই বিধিনিষেধের শুষ্ক কঠিন ব্যবস্থাকে একেবারে আচ্ছন্ন এবং অন্তরাল করিয়া দিয়া, যখন একই সরস অনুভূতির নাড়িজাল সমগ্রের মধ্যে প্রাণের চৈতন্যকে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে তখনই জানিব মহাজাতি দেহধারণ করিয়াছে।

আমরা যে-সকল দেশের ইতিহাস পড়িয়াছি তাহারা বিশেষ বিশেষ পথ দিয়া নিজের সিদ্ধির সাধনা করিয়াছে। যে বিশেষ অমঙ্গল তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় তাহারই সঙ্গে তাহাদিগকে লড়িতে হইয়াছে। একদিন আমেরিকার একটি সমস্যা এই ছিল যে, ঔপনিবেশিকদল এক জায়গায়, আর তাহাদের চালকশক্তি সমুদ্রপারে, ঠিক যেন মাথার সঙ্গে ধড়ের বিচ্ছেদ- এরূপ অসামঞ্জস্য কোনো জাতির পক্ষে বহন করা অসম্ভব। ভূমিষ্ঠ শিশু যেমন মাতৃগর্ভের সঙ্গে কোনো বন্ধনে বাঁধা থাকিতে পারে না- নাড়ি ছেদন করিয়া দিতে হয়- তেমনি আমেরিকার সম্মুখে যেদিন এই নাড়ি ছেদনের প্রয়োজন উপস্থিত হইল সেদিন সে ছুরি লইয়া তাহা কাটিল। একদিন ফ্রান্সের সম্মুখে একটি সমস্যা এই ছিল যে, সেখানে শাসয়িতার দল ও শাসিতের দল যদিচ একই জাতিভুক্ত তথাপি তাহাদের পরস্পরের জীবনযাত্রা ও স্বার্থ এতই সম্পূর্ণ-বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেই অসামঞ্জস্যের পীড়ন মানুষের পক্ষে দুর্বহ হইয়াছিল। এই কারণে এই আত্মবিচ্ছেদকে দূর করিবার জন্য ফ্রান্সকে রক্তপাত করিতে হইয়াছিল।

বাহ্যত দেখিতে গেলে, সেই আমেরিকা ও ফ্রান্সের সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল আছে। ভারতবর্ষেও শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর অসংলগ্ন।

তাহাদের পরস্পর সম-অবস্থা ও সমবেদনার কোনো যোগই নাই। এমন স্থলে শাসনপ্রণালীর মধ্যে সুব্যবস্থার অভাব না ঘটিতে পারে- কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবস্থার অপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন অনেক বেশি। যে আনন্দে মানুষ বাঁচে এবং মানুষ বিকাশ লাভ করে, তাহা কেবল আইন-আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়া নহে। ফল কথা, মানুষ আধ্যাত্মিক জীব- তাহার শরীর আছে, মন আছে, হৃদয় আছে; তাহাকে তৃপ্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তকেই তৃপ্ত করিতে হয়। যে-কোনো পদার্থে সজীব সর্বাঙ্গীণতার অভাব আছে তাহাতে সে পীড়িত হইবেই। তাহাকে কোন্ জিনিস দেওয়া গেল সেই হিসাবটাই তাহার পক্ষে একমাত্র হিসাব নহে, তাহাকে কেমন করিয়া দেওয়া হইল সেই হিসাবটা আরও বড়ো হিসাব। উপকার তার পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে, যদি সেই উপকারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তির উপলব্ধি না থাকে। সে অত্যন্ত কঠিন শাসনও নীরবে সহ্য করিতে পারে, এমন-কি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বরণ করিতে পারে, যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার আনন্দ থাকে। তাই বলিতেছিলাম, একমাত্র সুব্যবস্থা মানুষকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে না।

অথচ যেখানে শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর দূরবর্তী হইয়া থাকে, উভয়ের মাঝখানে প্রয়োজনের অপেক্ষা উচ্চতর আত্মীয়তর কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হইতে বাধা পায়, সেখানে রাষ্ট্রব্যাপার যদি অত্যন্ত ভালোও হয় তবে তাহা বিশুদ্ধ আপিস-আদালত এবং নিতান্তই আইনকানুন ছাড়া আর-কিছু হইতেই পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ কেন যে কেবলই কৃশ হইতে থাকে, তাহার অন্তর বাহির কেন যে আনন্দহীন হইয়া উঠে, তাহা কর্তা কিছুতেই বুঝিতে চান না, কেবলই রাগ করেন- এমন-কি, ভোক্তাও ভালো করিয়া নিজেই বুঝিতে পারে না। অতএব শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকাতে যে জীবনহীন শুষ্ক শাসনপ্রণালী ঘটা একেবারেই অনিবার্য, ভারতের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

তাহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সঙ্গে বর্তমান ভারতের একটা মিল আছে, সে কথাও মানিতে হইবে। আমাদের শাসনকর্তাদের জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়সাধ্য। তাঁহাদের খাওয়া-পরা বিলাস-বিহার, তাঁহাদের সমুদ্রের এপার ওপার দুই পারের রসদ জোগানো, তাঁহাদের এখানকার কর্মাবসানে বিলাতি অবকাশের আরামের আয়োজন, এ-সমস্ত আমাদিগকে করিতে হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের বিলাসের মাত্রা কেবলই অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই-সমস্ত বিলাসের খরচা জোগাইবার ভার এমন ভারতবর্ষের যাহার দুইবেলার অন্ন পুরা পরিমাণে জোটে না। এমন অবস্থায় যাহারা বিলাসী প্রবলপক্ষ তাহাদের অন্তঃকরণ নির্মম হইয়া উঠিতে বাধ্য। যদি তাহাদিগকে কেহ বলে, ওই দেখো এই হতভাগাগুলা খাইতে পায় না, তাহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হয় যে, ইহাদের পক্ষে এইরূপ খাওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহাই যথেষ্ট। যে-সব কেরানি পনেরো-কুড়ি টাকায় ভূতের খাটুনি খাটিয়া মরিতেছে, মোটা মাহিনার বড়ো সাহেব ইলেকট্রিক পাখার নীচে বসিয়া একবার চিন্তা করিতেও চেষ্টা করে না যে, কেমন করিয়া পরিবারের ভার লইয়া ইহাদের দিন চলিতেছে। তাহারা মনকে শান্ত সুস্থির রাখিতে চায়, নতুবা তাহাদের পরিপাকের ব্যাঘাত এবং যকৃতের বিকৃতি ঘটে। এ কথা যখন নিশ্চিত যে অল্পে তাহাদের চলে না, এবং ভারতবর্ষের উপরেই তাহাদের নির্ভর, তখন তাহাদের তুলনায় তাহাদের চারি দিকের লোকে কী খায় পরে, কেমন করিয়া দিন কাটায়, তাহা নিঃস্বার্থভাবে তাহারা বিচার কখনোই করিতে পারে না। বিশেষত এক-আধজন লোক তো নয়- কেবল তো একটি রাজা নয়, একজন সম্রাট নয়- একেবারে একটি সমগ্র জাতির বাবুয়ানার সম্বল এই ভারতবর্ষকে জোগাইতে হইবে। যাহারা বহুদূরে থাকিয়া রাজার হালে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জন্য আত্মীয়তা-সম্পর্কশূন্য অপর-জাতিকে অন্নবস্ত্র সমস্ত সংকীর্ণ করিয়া আনিতে হইতেছে, এই-যে নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য ইহা যে প্রতিদিন বাড়িয়াই

চলিল তাহা কেবল তাঁহারাই অস্বীকার করিতেছেন যাঁহাদের পক্ষে আরাম অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব, এক পক্ষে বড়ো বড়ো বেতন, মোটা পেনশন এবং লম্বা চাল, অন্য পক্ষে নিতান্ত ক্লেশে আধ-পেটা আহারে সংসারযাত্রা নির্বাহ- অবস্থার এই অসংগতি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। শুধু অন্নবস্ত্রের হীনতা নহে, আমাদের তরফে সম্মানে লাঘব এত অত্যন্ত অধিক, পরস্পরের মূল্যের তারতম্য এত অতিমাত্র, যে, আইনের পক্ষেও পক্ষপাত বাঁচাইয়া চলা অসাধ্য, এমন স্থলে যত দিন যাইতেছে ভারতবর্ষের বক্ষের উপর বিদেশীর ভার ততই গুরুতর হইতেছে, উভয়পক্ষের মধ্যেকার অসাম্য নিরতিশয় অপরিমিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আজ আর কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। ইহাতে এক দিকে বেদনা যতই দুঃসহ হইতেছে আর-এক দিকে অসাড়তা ও অবজ্ঞা ততই গভীরতা লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থাই যদি টিঁকিয়া যায় তবে ইহাতে একদিন না একদিন ঝড় আনিয়া উপস্থিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ কতকটা ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তথাপি আমাদিগকে বলিতে হইবে বিপ্লবের পূর্বে আমেরিকা ও ফ্রান্সের সম্মুখে যে একমাত্র সমস্যা বর্তমান ছিল, অর্থাৎ যে সমস্যাটির মীমাংসার উপরেই তাহাদের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিত, আমাদের সম্মুখে সেই সমস্যাটি নাই। অর্থাৎ আমরা যদি দরখাস্তের জোরে বা গায়ের জোরে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে রাজি করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের সমস্যার কোনো মীমাংসাই হয় না; তাহা হইলে হয় ইংরেজ আবার ফিরিয়া আসিবে, নয় এমন কেহ আসিবে যাহার মুখের গ্রাস এবং পেটের পরিধি ইংরেজের চেয়ে হয়তো ছোটো না হইতে পারে।

এ কথা বলাই বাহুল্য, যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ, স্বাধীনতার “স্ব’ জিনিসটা কোথায়?

স্বাধীনতা, কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালি যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না, এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্বপ্রান্তের আসামি তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীন হইবে কে। হাতের সঙ্গে পা, পায়ের সঙ্গে মাথা যখন একেবারে পৃথক হইয়া হিসাব মিলাইতে থাকে তখন লাভ বলিয়া জিনিসটা কাহার।

এমন তর্কও শুনা যায় যে, যতদিন আমরা পরের কড়া শাসনের অধীন হইয়া থাকিব ততদিন আমরা জাত বাঁধিয়া তুলিতেই পারিব না, পদে পদে বাধা পাইব এবং একত্র মিলিয়া যে-সকল বড়ো বড়ো কাজ করিতে করিতে পরস্পরে মিল হইয়া যায় সেই-সকল কাজের অবসরই পাইব না। এ কথা যদি সত্য হয় তবে এ সমস্যার কোনো মীমাংসাই নাই। কারণ, বিচ্ছিন্ন কোনোদিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারে না; বিচ্ছিন্নের মধ্যে সামর্থ্যের ছিন্নতা, উদ্দেশ্যের ছিন্নতা, অধ্যবসায়ের ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন জিনিস জড়ের মতো পড়িয়া থাকিলে তবু টিঁকিয়া থাকে কিন্তু কোনো উপায়ে কোনো বায়ুবেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তাহার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে; তাহার অভ্যন্তরের সমস্ত দুর্বলতা নানা মূর্তিতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। নিজেরা এক না হইতে পারিলে আমরা এমন- কোনো এককে স্থানচ্যুত করিতে পারিব না যাহা কৃত্রিমভাবেও সেই ঐক্যের স্থান পূরণ করিয়া আছে।

শুধু পারিব না তাহা নহে, কোনো নিতান্ত আকস্মিক কারণে পারিলেও, যে একটিমাত্র বাহ্যবন্ধনে আমরা বিধৃত হইয়া আছি তাহাও ছিন্ন হইয়া

পড়িবে। তখন আমাদের নিজের মধ্যে বিরোধ বাধিলে, আমরা কোনো এক প্রকার করিয়া কিছুকাল মারামারি-কাটাকাটির পর তাহার একটা-কিছু মীমাংসা করিয়া লইব ইহাও সম্ভব হইবে না। আমাদিগকে সেই সময়টুকুও কেহ দিবে না। কারণ, আমরাই যেন আমাদের সুযোগের সুবিধাটুকু লইবার জন্য প্রস্তুত না থাকিতে পারি, কিন্তু জগতে যে-সকল জাতি সময়ে অসময়ে সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে তাহারা আমাদের ঘরাও যুদ্ধকাণ্ড অভিনয়ের দর্শকদের মতো দূরে বসিয়া দেখিবে না। ভারতবর্ষ এমন স্থান নহে লুব্ধের চক্ষু যাহার উপর হইতে কোনোদিনই অপসারিত হইবে।

অতএব যে দেশে বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া এক মহাজাতি তৈরি হইয়া উঠে নাই সে দেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব থাকিবে কি না থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে এমন-একটি উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই যাহার কাছে মাথা অবনত করিবে- এমন-কি ইংরেজ-রাজত্ব যদি এই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে তবে ইংরেজ-রাজত্বকেও আমাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা অন্তরের সহিত, প্রীতির সহিত স্বীকার করিবার অনেক বাধা আছে। সেই বাধাগুলিকে দূর করিয়া ইংরেজ-রাজত্ব কী করিলে আমাদের আত্মসম্মানকে পীড়িত না করে, কী করিলে তাহার সহিত আমাদের গৌরবকর আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, এই অতিকঠিন প্রশ্নের মীমাংসাভারও আমাদিগকে লইতে হইবে। রাগ করিয়া যদি বলি “না আমরা চাই না’, তবু আমাদিগকে চাহিতেই হইবে; কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এক হইয়া মহাজাতি বাঁধিয়া উঠিতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজ-রাজত্বের যে প্রয়োজন তাহা কখনোই সম্পূর্ণ হইবে না।

আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যা যে কী, অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিশন-ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতি নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং দেশের বিলাতি বস্ত্রহরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা যেমনি করিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতরো আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কষ্টকর হউক, কিন্তু আমাদের এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এ কথা আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপেই জানা আবশ্যক ছিল, আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক, এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাই-না কেন,এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনোই বিস্মৃত হইবে না। এ কথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।

ইংরাজ যদি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে সত্যই দাঁড় করাইয়া থাকে তবে ইংরাজ আমাদের একটি পরম উপকার করিয়াছে- দেশের যে-একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যকে আমরা মূঢ়ের মতো না বিচার করিয়াই দেশের বড়ো বড়ো কাজের আয়োজনের হিসাব করিতেছিলাম, একেবারে আরম্ভেই তাহার প্রতি ইংরেজ আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। ইহা হইতে কোনো শিক্ষাই না লইয়া আমরা যদি ইংরেজের উপরেই সমস্ত রাগের মাত্রা চড়াইতে থাকি তবে আমাদের মূঢ়তা দূর করিবার জন্য পুনর্বার আমাদিগকে আঘাত সহিতে হইবে; যাহা প্রকৃত যেমন করিয়াই হউক তাহাকে আমাদের বুঝিতেই হইবে; কোনোমতেই তাহাকে এড়াইয়া চলিবার কোনো পন্থাই নাই।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান, অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে, অতএব কোনোমতে মিলনসাধন করিয়া আমরা বল লাভ করিব এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড়ো কথা নয়, সুতরাং ইহাই সকলের চেয়ে সত্য কথা নহে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজনসাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি, নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। যিশু বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ কেবলমাত্র রুটির দ্বারা জীবনধারণ করে না। তাহার কারণ, মানুষের কেবল শারীর জীবন নহে। সেই বৃহৎ জীবনের খাদ্যাভাব ঘটিতেছে বলিয়া ইংরেজ-রাজত্ব সকল-প্রকার সুশাসন সত্ত্বেও আমাদের আনন্দ শোষণ করিয়া লইতেছে।

কিন্তু এই-যে খাদ্যাভাব এ যদি কেবল বাহির হইতেই, ইংরাজ-শাসন হইতেই ঘটিত তাহা হইলে কোনোপ্রকারে বাহিরের সংশোধন করিতে পারিলেই আমাদের কার্য সমাধা হইয়া যাইত। আমাদের নিজের অন্তঃপুরের ব্যবস্থাতেও দীর্ঘকাল হইতেই এই উপবাসের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। আমরা হিন্দু ও মুসলমান– আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি– এক জায়গায় বাস করিতেছি বটে, কিন্তু মানুষ মানুষকে রুটির চেয়ে যে উচ্চতর খাদ্য জোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে আমরা পরস্পরকে সেই খাদ্য হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত হিতচেষ্টা, পরিবার ও বংশের মধ্যে এবং এক-একটি সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্‌বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে

আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষটি বৃহৎ মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা মঙ্গলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি করিতে থাকিবে। এই উপলব্ধি তাহার কোনো বিশেষ কার্যসিদ্ধির উপায় বলিয়াই গৌরবের নহে, ইহা তাহার প্রাণ, ইহাই তাহার মনুষ্যত্ব, অর্থাৎ তাহার ধর্ম। এই ধর্ম হইতে সে যে পরিমাণেই বঞ্চিত হয় সেই পরিমাণেই সে শুষ্ক হয়। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে আমরা এই শুষ্কতাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞান, কর্ম, আচারব্যবহারের, আমাদের সর্বপ্রকার আদান-প্রদানের বড়ো বড়ো রাজপথ এক একটা ছোটো ছোটো মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে; আমাদের হৃদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবার অবসর পায় নাই। এই কারণে আমরা পারিবারিক আরাম পাইয়াছি, ক্ষুদ্র সমাজের সহায়তা পাইয়াছি, কিন্তু বৃহৎ মানুষের শক্তি ও সম্পূর্ণতা হইতে আমরা অনেকদিন হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনহীনের মতো বাস করিতেছি।

সেই প্রকাণ্ড অভাব পূরণ করিবার উপায় আমরা নিজের মধ্যে হইতেই যদি বাঁধিয়া তুলিতে না পারি তবে বাহির হইতে তাহা পাইব কেমন করিয়া? ইংরেজ চলিয়া গেলেই আমাদের এই ছিদ্র পূরণ হইবে আমরা এ কল্পনা কেন করিতেছি। আমরা যে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি নাই, সহায়তা করি নাই, আমরা যে পরস্পরকে চিনিবার মাত্রও চেষ্টা করি নাই, আমরা যে এতকাল "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ' করিয়া বসিয়া আছি; পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের সেই ঔদাসীন্য অবজ্ঞা সেই বিরোধ আমাদিগকে যে একান্তই ঘুচাইতে হইবে সে কি কেবলমাত্র বিলাতি কাপড় ত্যাগ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সে কি কেবলমাত্র ইংরাজ কর্তৃপক্ষের নিকট নিজের শক্তি প্রচার করিবার উদ্দেশে।

এ নহিলে আমাদের ধর্ম পীড়িত হইতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব সংকুচিত হইতেছে; এ নহিলে আমাদের বুদ্ধি সংকীর্ণ হইবে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হইবে না- আমাদের দুর্বল চিত্ত শত শত অন্ধসংস্কারের দ্বারা জড়িত হইয়া থাকিবে- আমরা আমাদের অন্তর-বাহিরে সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বিশ্বসমাজের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিব না। সেই নির্ভীক নির্বাধ বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ধর্মের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনোমতেই বড়ো হইতে পারে না, কোনোমতেই সত্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে-কেহ আছে, যে-কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব- ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে সমস্যা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র- নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট- সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে, কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা, মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরমপ্রেমের দ্বারা, উচ্চনীচ আত্মীয়পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে, শুভচেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও- যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় করো, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত করো। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করো, বারম্বার আঘাত করো- কোনো নৈরাশ্যে, কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুন্নতায় ফিরিয়া যাইয়ো না; মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনোই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। সেই আহ্বান যে সংবাদপত্রের ক্রুদ্ধ গর্জনের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে বা হিংস্র উত্তেজনার মুখরতার মধ্যেই তাহার যথার্থ প্রকাশ, এ কথা আমরা স্বীকার করিব না; কিন্তু সেই আহ্বান যে আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্‌বোধিত করিতেছে তাহা তখনই

বুঝিতে পারি যখন দেখি আমরা জাতিবর্ণ-নির্বিচারে দুর্ভিক্ষকাতরের দ্বারে অন্নপাত্র বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছি, যখন দেখি ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া প্রবাসে সমাগত যাত্রীদের সহায়তার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি, যখন দেখি রাজপুরুষদের নির্মম সন্দেহ ও প্রতিকূলতার মুখেও অত্যাচার-প্রতিরোধের প্রয়োজনকালে আমাদের যুবকদিগকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা বাধা দিতেছে না। সেবায় আমাদের সংকোচ নাই, কর্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে, পরের সহায়তায় আমরা উচ্চনীচের বিচার বিস্মৃত হইয়াছি, এই-যে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি- এবার আমাদের উপরে যে আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সংকীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে, ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে। এবারে, যেখানে যাহার কোনো অভাব তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদিগকে যাইতে হইবে; অন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিগকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; আমাদিগকে আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় লইয়াই আসে- কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই নূতন আবির্ভাবের সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, বজ্রের গর্জন এবং বায়ুর উন্মত্ততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে- তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের পূর্বপশ্চিম স্নিগ্ধতায় আবৃত হইয়া যাইবে- চারি দিকে ধারাবর্ষণ হইয়া তৃষিতের পাত্রে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্ষুধিতের ক্ষেত্রে অন্নের আশা অঙ্কুরিত হইয়া দুই চক্ষু জুড়াইয়া দিবে। মঙ্গলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে, এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তুত হই। কিসের জন্য। ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্য, মাটি চষিবার জন্য, বীজ বুনিবার জন্য; তাহার পরে সোনার ফসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য।

১৩১৫

সূচিপত্র